ইরাবতী থেকে নায়েগ্রা

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৫৫

প্রকাশক : ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক : দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
৮১ সিমলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : নরেন্দ্রনাথ দত্ত
দাম : ছয় টাকা

নিবেদন

এই লেখাগুলির রচনাকাল বহুদিন বিস্তৃত এবং ভারতবর্ষের বাইরে দুটি দেশের সঙ্গেও কিছুটা সংশ্লিষ্ট। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে চাকরীর চাকায় ঘুরতে ঘুরতে বেশ কয়েক বছর ব্রহ্মদেশে কেটেছিল। বয়স তখন ছিল অপেক্ষাকৃত কম, দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল দেখবার, জানবার, শোনবার উৎসাহ। ঐ কর্মযোগেরই বিয়োগের প্রান্তিকে মার্কিন মহালক্ষ্মীর প্রসাদলাভের জন্য যেতে হয়েছিল অতলান্তিকের তীরে। তখন দেশ স্বাধীন, আমাদের রাষ্ট্রগুরু বা চিন্তানায়করা কল্পনা করছেন—অন্ন বস্ত্র হবে, দারিদ্র্য দূর হবে, সমাজব্যবস্থা বদলে যাবে, নূতন নূতন কর্মতীর্থ গড়ে উঠবে, মানুষ খেয়ে পরে বাঁচার মত বাঁচবে। অতএব সারা বিশ্ব থেকে আহরণ করে নিয়ে এসো যে যা দিতে পারে, অর্থ, সামর্থ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রয়োগ বিদ্যা। লক্ষ্মীর ঝাঁপি ভরে উঠুক।

ভারতের বাইরে যে দুটি দেশের সঙ্গে আমার কর্ম এষণা যুক্ত হয়েছিল তাদেরি দুটি কলস্বনার নামে আমার চিত্ত প্রতীক যদি গড়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে মিশে যায় আমার দেশের মাটির কথা, তার ঐতিহ্যের কাহিনী, তার ইতিহাসের বিবরণ, তার সাহিত্যের সম্ভার, তাহলে ক্ষতি কোথায়। কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে

If I should meet thee
After long years
How should I greet thee
With silence and tears

সরস্বতী শুধু বিদ্যার বিগ্রহ দেবতা নন, নদীরূপাও। কলকল ছলছল করে শুধু মাটিকে নয়, মনকেও প্লাবিত করে দিয়ে যাচ্ছেন, এই—সেই গতির সুরটিকেই ধরতে চেয়েছি আমার বইএ এবং তারিই প্রতীক ঐ চঞ্চলা নদী। বৈদিক কবি বলেছিলেন—জননি, তোমার স্নিগ্ধ সাহচর্য থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রেখোনা, সখীর মত তুমি সর্বদা নিকটে থেকো। ইরাবতী ও নায়েগ্রাকেও

গঙ্গা,যমুনা কৃষ্ণা কাবেরীর সঙ্গে আমার মনের অভিবাদন জানাই। নামকরণের এই যৌক্তিকতা বা সার্থকতা সম্বন্ধে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে, তবু বলবো, সেটা এহবাহ্য। সবদেশে মোর ঠাঁই আছে, এ কথা আমাদের দেশের কবিরই। তিনভুবন জুড়েই বান্ধব।

সময়ের মাপকাঠিতে ব্রহ্মদেশ দর্শন ও একালের কুবের দেশ দর্শনের মধ্যে শতাব্দীর একপাদেরও বেশী ব্যবধান—এর মধ্যে ঘটেছে বহু ঘটনা—রাজ্য গেছে ছুটে, সাম্রাজ্য গেছে টুটে, নদীর এপার ওপার হয়ে গেছে পর। এরই আগে পিছু ঘুরেছি আমরা দেশের মাটির 'পরে যেখানে বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা, পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। সেখানে দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে শুধু মুনি অতীতের কথা নয়, অনাগত দিনের কাহিনী নয়, কনকোজ্জ্বল বরণীর ইতিহাস নয়, জীবনের শত মালিন্য গ্লানি বেদনার গল্প নয়, স্বপ্নের, ধ্যানের, মননের ভারতবর্ষের ছবিও। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিশেছে যে সেথায় ত্রিধারার ত্রিকায়ে। আমার অজ্ঞাতে সেই সন্ধানী চেতনা আশ্রয় নিয়েছে আধুনিক কালের কয়েকজন বিশিষ্ট ভারত-পুরুষদের স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে। তাঁরা কিছু কিছু ভিড় করেছেন আমার পদাবলীর পদযাত্রার আখ্যায়িকায়। যে সময়-সন্ধিক্ষণে আমার জন্ম, যে কালে আমার কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত, সেই যুগে সেই লোকোত্তরদের প্রভাব আমাদের মত অখ্যাত অর্বাচীনদের মনকেও ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত করে তুলবে, এর ঐতিহাসিকতা অলঙ্ঘনীয়। অবচেতনে তার ছায়া যদি পড়ে থাকে তবে তার জন্য ক্ষোভ ত নেইই, লোভ আছে সম্পূর্ণ লাভের আশায়। তবু পুরোনো খুঁটি ও ঘুঁটি ছেড়ে এগিয়ে যেতে হয়। চরৈবেতে বলেছিলেন সেকালের মহীদাস, ইতরার পুত্র, মাটি মায়ের ছেলে। একালেও চলার মন্ত্র সেই একই।

আমি জানি, এই লেখাগুলি নিছক ভ্রমণ কাহিনী বা 'ট্রাভেলোগ' হয়ে ওঠেনি, হোটেল-মোটেল মাঠ-ঘাট দেওয়া-নেওয়া যাওয়া-আসার পূর্বরাগরঞ্জিত রম্যরচনাও হতে পারেনি, সে ত্রুটি মার্জনীয়। এই আলেখ্যগুলি হচ্ছে হাল ছেড়ে দিয়ে উজিয়ে-যাওয়া ভাঁটিয়ে-আসা যাযাবর মানসের অভিসার যাত্রার একটু খাপছাড়া ইতিহাস, পথিক মনের অপটু প্রয়াস। অতএব ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ।

এই রচনাগুলি প্রকাশিত হতোনা যদি না বিখ্যাত প্রকাশক রূপা কোম্পানীর শ্রীযুক্ত মেহেরা মহোদয় এর প্রাণপ্রতিষ্ঠার আয়োজন স্বেচ্ছায় ও সানন্দে না করতেন। তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ। এই শুভবুদ্ধির প্রেরণা দিয়েছেন

যাঁরা—সাহিত্য রসিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ ও সুসাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন মাইতি—তাঁদেরও সশ্রদ্ধ সাধুবাদ জানাই।

দু-একটা ছাপার ত্রুটি রয়ে গেছে সেগুলি আমারই অনবধানতার দরুন। নানা পত্র পত্রিকায় বছরের পর বছর এই লেখাগুলি বেরিয়েছে, যাঁরা প্রকাশ করেছেন, যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা সমালোচনা করেছেন এবং যাঁরা পড়েননি তাঁদের সকলকেই আমার নমস্কার জানানো রইলো—আর প্রণাম রইলো চলার পথে প্রতিটি ধূলির প্রতি—মধুমৎপার্থিবং রজঃ!

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ এক

আমি চলেছি।

পায়ে হেঁটে, পথটা মাড়িয়ে, মাটির স্পর্শ নিয়ে। মহাশক্তি যে অবরুদ্ধ সেখানে, মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি—যে বীর্য অলঙ্ঘনীয়।

আমি চলেছি। কিন্তু আমি বলতে পারছি না—হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর আমারে দিয়েছ শুধু পথ। পথে আমি নেমেছি কিন্তু পথ আমায় নামায় নি।

তীর্থযাত্রী আমি নই, কোনো মানত আমি করি নি, দেবদ্বিজে বিশ্বাস কম। সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ আমার আসে না, গীতার ভূমিকা আমি লিখি না, যাযাবর ভবঘুরে মন নিয়ে আমার কারবার নয়, পথে পথে ঘুরে বেড়াবার নেশা নেই আমার। নিতান্তই ঘরমুখী প্রাণী, আসক্তির ঘানিতে বাঁধা—নিজের ছোট্ট গণ্ডিতেই আবদ্ধ—তারই মধ্যে ঘোরে আমার প্রাণচক্র, কর্মফলেষু জুষ্টাম্।

তবু কাজে অকাজে মাঝে মাঝে পথে বিপথে এসে দাঁড়াতে হয়। পায়ের নিম্নের দিকে শুধু নয়—উপরের দিকেও তাকাতে হয়, দেখি কখনো দীপ্ত মধ্যাহ্নে তাপসী অগ্নিবর্ণা জ্বলছে, সন্ধ্যায় অনন্তযৌবন আকাশ হাতছানি দিচ্ছে, অপরূপা তামসী রাত্রি ঘনান্ধকারে তারার ঘোমটা খসিয়ে লাজরক্ত চোখদুটি তুলে মিনতি জানাচ্ছে, মেঘের ভার নিয়ে বিদ্যুৎবাহিনী এলোকেশী আকাশ কালো করে নামছে। ভোরের আগের যে প্রহরে দেবতাদের ঘুম ভাঙে, সেই ক্ষণের আগমনী কোথায়, যা নিয়ে আসবে কালোর বহির্বাস ছিঁড়ে দীপ্ত আলোর মাঙ্গলিককে। বহু যুগের বহু স্মৃতির চরণচিহ্ন আঁকা যে সেখানে, বহু বৃহস্পতির মনন। কালপুরুষ সিরিয়স হোরাসের দল আসর জমায়, অরুন্ধতীরা বাসরে আসে আশীর্বাণীর বরণডালা সাজিয়ে। সব মিলিয়েই চলে জগন্নাথের রথ। তারি তালে তালে দুনিয়ার পদাতিক মানুষের কাব্য সুর গাওয়া, শত যুগান্ত আগে যে মানুষ যাত্রা শুরু করেছিল। ওগো কর্ণধার আমি কি তাদেরই উত্তরপুরুষ! যে আগুনকে তারা লালন করেছিলেন বুকের প্রেম দিয়ে, ধমনীর রক্ত দিয়ে, বাহুর শক্তি দিয়ে, প্রবঞ্চিতের দাহ দিয়ে, হিংসা-দ্বেষ-কামনা-কলহের উপচারে, সে আগুন হারিয়ে গেল কোথায়, দগ্ধ হল কারা, কোন্ হোমশিখা হল অনলবর্ষী, লুকাল কোথায় তার স্ফুলিঙ্গ

যে মহাস্রোতের ধারাতে পড়েছে শতসহস্র সমিধ, কত আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি যেখানে রচিত হয়েছে, সেই কালস্রোতে ভেসে-আসা মহাবীজের আমিই কি অধস্তন অধিকারী, উত্তরসাধক! ভয় করে এত ক্ষুরধার ভার আমি বইব কি করে, এত মার সইব কি করে? যা পেয়েছি তার কতটুকু আমি দিয়ে যেতে পারব আমার পরবর্তীদের, যা পাই নি তার বিক্ষোভ কতটুকু সঞ্চারিত হবে আমার পুত্রপৌত্র অনাগতদের মধ্যে! এই বিরাট যাত্রাযজ্ঞে আমরা সবাই যে চলেছি, সকলেরই নিমন্ত্রণ—এ পথে কেউ দেয়, কেউ নেয়, কেউ হয় নিষ্ফল, কেউ চলে রুদ্ধ আক্রোশ নিয়ে, কেউ চলে বন্ধ্যা জিজ্ঞাসা নিয়ে, তবু চলে সবাই, ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে, শ্রান্ত হয়ে জল খায়, আবার চলে, মাতাল পৃথিবীর কণ্ঠবিলগ্ন হয়ে শোনে যৌবনের গান, যার কোষে কোষে নবসৃষ্টির আশ্লেষ। তারপর একদিন শ্লথবৃন্ত ফলের মত টুপ করে ঝরে মিলিয়ে যায় বুদ্বুদের মত এক সীমাহীনের রহস্য-সাগরে। পরবর্তীরা স্থান পূরণ করে—মিছিলের কিন্তু শেষ হয় না, মঙ্গলঘটের বারি সিঞ্চিত হয় না, বৈরাগীর শান্তিমন্ত্র পাঠও নয়। আকাশের তারায় তারায় গম্ভীর পথ বেয়ে দেখেছি সেই পূর্বসূরীদের সংকেত, মাটির কাঁপনে কাঁপনে শুনেছি নব আগন্তুকদের আভাস। একদল হয়েছেন লয়, আর একদল পাবে আলয়—এই মহালয়ার মধ্য দিয়েই তিমিরাভিসারের যাত্রা কোন্ আলোর মালায়, কোন্ দীপান্বিতায় শেষ হবে কে জানে! ঋগ্বেদের একটি সূক্তে আছে ইন্দ্র জন্ম দিলেন সূর্যের, ফিরে পেলেন জ্যোতির সমষ্টি, রাত্রির মধ্য থেকে দিনের প্রকাশ ঘটিয়ে।

বাল থেকে বেলুড়—মনে হচ্ছে অনেক দূর—ঐ তো ওপারে দক্ষিণেশ্বরে, দক্ষিণপাণির ঘর। দেখেছি কি—ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা খাট, ভগ্ন নহবৎখানা, যেখানে পূরবী আর মেলে না বিভাসে, বেহাগের সঙ্গে মালকোষের হয় না মিলন। আমি জানি, দেবী ভবতারিণী তুমি হাসছ, বলছ—ছি, ছি একমাইল গিয়েই লিখবে লক্ষ মাইলের ইতিহাস, লক্ষ মনকে লক্ষ্যে না পৌঁছে দিয়ে করবে শুধু অন্ধ পরিক্রমা, ভাষার আড়ম্বরে ঢাকতে চাইবে ভাবের অভাব, মনের দৈন্য, চিন্তার আবিলতা, কথার প্যাঁচের জাঁতাকলে পিষে মারবে যা বলতে চাইছ তাকে। ঘটা করে ঘণ্টাকর্ণ পুজো একেই বলে—এত শুধু শৌখীন মজদুরি নয়, পুকুরচুরিও নয়, একেবারে ঘটিচুরি।

একমাইল পথ, একটি মানুষ, একটি মন্দির, একটি মঠ, একটি বীরশিল্প, একটি মেঘাঙ্গী বিগতাম্বরা কালী কপালভরণা—"অজামেকাং লোহিত শুক্ল-

কৃষ্ণাং" এই নিয়েই আমার রূপকথার শুরু। সারা হতে অবশ্য বেশি দেরি নেই। তবু পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে আসা রাজার ছেলের গল্প এটা নয়, সওদাগর পুত্রের মনবনবিহারিণী কমলে-কামিনী এখানে নেই, মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্রের তলোয়ার হয়ে গেছে ভোঁতা, বিহঙ্গম বিহঙ্গমীরা প্রেমের ফাঁদের ধাঁধার উত্তর দেয় না, ভোমরা-ভোমরীদের ভনভনানি গেছে হারিয়ে। সাতমানিকের জলুষে-ভরা সোনার জীয়নকাটি সাতশো হাত নিচে ডুবে গেছে মাটির পদ্মমূলে পদ্মাসনার কোলে; মেদিনী করেছেন রথচক্রগ্রাস।

তুমি হাসলে, বললে—হয়েছে যাক, ফাঁকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ কেন, সামান্য লেখাও হয় না—রসসৃষ্টি ত নয়ই—একে রচনা বলব না, গোময়-সিক্ত বলতে পারি বটে—রম্য তো দূরের কথা, তবে কিঞ্চিৎ গব্য পদার্থ আছে বটে। সাহিত্যের অভিজাত মহলে হে অপাংক্তেয় ব্রাত্য তুমি, কর্ণপটাহ বিদ্ধ করে, ইনিয়ে বিনিয়ে ভাব ও ভাষা চুরি করে যে-কোনো কাহিনী লেখ না কেন, দুন্দুভি বাজিয়ে তাকে তাড়া করতে কতক্ষণ লাগে—আশা কোরো না যে কেউ তা উল্টেপাল্টে দেখবে, পয়সা দিয়ে কিনে পড়বে—যার মূল্য এক কানাকড়িও নয়। হয়তো তাই। তবু আমি গেছি বেলুড়ে, দক্ষিণেশ্বরে, তারপর হয়তো যাব আরো দূরে—লিখছি সেইসব কথা, আমার মনের সিসমোগ্রাফে যে ওঠাপড়ার, ভাঙাগড়ার, দোলা লাগার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হচ্ছে তারই কাহিনী। আর বলছি—হে অতীত, তুমি কথা বন্ধ কর, আমায় ভাবতে দাও, হে মহাভবিষ্যৎ তুমি শুধু কথা কও—তুমি মুখর হও, প্রখর হও, নখর হও, বিদ্ধ বিদীর্ণ কর যত বাধা। সব পথ এসে মিশে যাক শেষে তোমার দুখানি নয়নে।

হ্যাঁ, দেশে বিদেশে খুঁজেছি সেই পথ যেখানে সব পথ এসে মিশে গেছে সর্বমানবের ক্ষেত্রে, সর্ব উত্তেজনার প্রশান্তিতে, সবভাবের সমন্বয়ে—শুধু মুক্তিতে নয়, ভুক্তিতে, যে ভোগ প্রকাশ পায় সেবায়, জীবকে শিবজ্ঞানে, যিনি বহুরূপে সম্মুখে। নিত্য আর লীলা আমি দুটোই লই—নইলে আমার ওজনে কম পড়ে—জল স্থির থাকলেও জল, হেল্‌লে দুল্‌লেও জল।

তাই তো আজকের কবির ভাষায় একটু বদলে বলি—

হৃদয়ে আমার উদয় যদি না হও তুমি
মাটি শুধু মাটি থেকে যাবে, হবে না প্রাণের দিব্য ভূমি।

॥ দুই

বেলুড়ের পথে যেতে যেতে স্মরণে পড়ে বহু যুগের ওপার হতে হাতছানি দিচ্ছে একটি মেঘমেদুর সন্ধ্যার সজল ছবি, শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্রবেলায় চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা। মনে হচ্ছে কবির সঙ্গে বলি

ছবি, তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা?

বহু বৃহস্পতির, বাক্‌পতির, প্রিয়পতির স্মৃতিতে ভরা মনের রাজ্যপাটে সোনার জলে আঁকা সে চিত্র।

আমি তখনও বালক বললেই হয়, বয়সটা যথারীতি প্রথম কৈশোরের বয়ঃসন্ধির রঙীন সীমানায় পৌঁছেছে। সবে চোখ মেলে দেখছি, কান পেতে শুনছি, মন দিয়ে বুঝছি যে একটা অদ্ভুত বিচিত্র জগতে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। আজকে প্রাণলীলার শেষ সপ্তকে এসে দেখছি যে আলোড়িত তপ্ত বাষ্প নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের সংঘাতে বিদ্বেষে কামনায় অনুরাগে আমরা সবাই যে যার নিজের জগতের একটি স্বতন্ত্র কক্ষ-পথ সৃষ্টি করে চলেছি। জানি না সেই অতীত যুগকে কল্পনায় টেনে এনে মনের বার্ধক্যেরই পরিচয় দিচ্ছি কিনা। সে দিন প্রতিটি রূপই আমায় আশ্চর্য করে দিত, প্রতিটি রসই মনোহারী বেশে আসত। বর্ষার দিনে ঝরঝর বারিপাতের সঙ্গে যখন ভেককুল সরব হত, শরৎকালের প্রথম সোনালী আলোয় শিউলি ফুলের গন্ধে যখন ঘুম ভাঙত তখন কেমন এক অজানা বেদনায় মন চঞ্চল হয়ে উঠত, সে খবর আজকের দিনে একেবারে অচল। এমনি একটি দোলা-লাগা বয়স যখন ভাবের আবেগ, ভক্তির নিবিড়ত্ব, কল্পনার প্রলেপ, বন্ধুত্বের গভীরত্ব মনকে নাড়া দিতে শুরু করেছে। ছোট্ট গণ্ডির বাইরে একটা বিশাল জগতের একটু আধটু ছোঁয়া এসে লাগছে, নতুন-ফোটা কাঁটালি-চাঁপার মত। যৌথ-সংসারের সুখদুঃখের সঙ্গে মানুষ-হওয়া মন এই বয়সেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তখন পাঁচজনকে নিয়েই ছিল বাঙালী মধ্যবিত্তের সংসার। সেখানে কষ্টক্লেশও ছিল, হলাহলও ফুটত, কিন্তু তবু এতটা আত্মকেন্দ্রিক উদরসর্বস্ব অনুদার চিত্তবৃত্তি ছিল না। গরীব ভাইপোরা আশ্রয় পেত, মাতৃহীনা ভাগনীদের বর জুটত। মনে পড়ে সবাই মিলে একসঙ্গে সন্ধেবেলায় ঠাকুমা-দিদিমা-মাসী-পিসীদের ছেঁড়া বালাপোশের নিচে উষ্ণ নিভৃতিতে বসে গল্প শোনা—শুধু দৈত্যদানা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর নয়, স্তিমিত প্রদীপের নিচে কথক-

ঠাকুরের কাছে শোনা ধ্রুবপ্রহ্লাদের কাহিনী, কর্ণের মদায়ত্ত পৌরুষের গল্প, রামসীতার অপূর্ব কথা। পূজোর ষষ্ঠীর দিন শুনতাম আগমনীর সুর—উমা আমার ঘরে এল—এক যে ছিল রাজার মেয়ে, গিরিরাজনন্দিনী তিনি। দশমীর দিন তাঁকেই আবার নয়নজলে বিদায় দিয়ে আসতাম শারদ নদীর ভরাস্রোতে।

এমনি একদিনে, গ্রীষ্মের ছুটি তখন, ক্লাস বন্ধ—খর বৈশাখের প্রখর অপরাহ্ণ—বাইরের তাপমাত্রা একশো চার-পাঁচ ছাড়িয়েছে, অগ্নিস্নানে শুচি হচ্ছে ধরা—বৃষ্টিবিহীন কঠোর বৈরাগী দিন। বাপখুড়োরা চলে গেছেন আফিসে আদালতে, মাঠাকুমার দল দরজা জানালা বন্ধ করে তালপাখা হাতে দিবানিদ্রায় মগ্ন—মনে হচ্ছে বিশ্বচরাচর যেন স্তব্ধ, সময়ের টিকটিকও বুঝি স্থগিত। আমাদের উপর জোর নির্দেশ—এই দাবদগ্ধ দিনে বাইরে হৈ হৈ করে না বেড়াই, আম-জাম-জামরুল-ফলসা গাছের কাছে না ঘেঁসি, আর পড়াগুলো যেন এগিয়ে রাখি, ইতিহাসের সূত্রগুলি মুখস্থ করি—ইউক্লিড আর ত্রিভুজ, অশোক আর আকবর যেন শুধু উঁকি মেরেই না চলে যান। কর্তারা এসে হিসাব নেবেন রাত্রে কড়ায় গণ্ডায় শতকিয়া শুভংকরীর সঙ্গে—হাকিম নড়বে ত হুকুম নড়বে না। আমার কিন্তু ভাল লাগতনা আঁক কষতে, ভাল লাগতনা গুণতে আওরংজেবের কটা ছিল নাতি বা কটা হাতি। মন চলে যেত সদ্যঃশেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতায়—আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে, হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে; বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, পথতরু-শাখে ধরেছে মুকুল, পারুল রজনীগন্ধা। কথা ও কাহিনী তখন সবে হাতে পড়েছে, যেন এক অপরূপ ঐশ্বর্যে-ভরা সোনার ঝাঁপি হাতে পেয়েছি, খুলে দেখি আর পড়ি। বালকমন শুধু সুয়োরানী দুয়োরানীর কথায়, অভিমানিনী কংকাবতীর ব্যথায় কল্পনায় উধাও হয়ে যায় নি তেপান্তরের মাঠে। যখন দুপুর বেলায় বৃষ্টি পড়ত টাপুর টুপুর, নদেয় এলো বান, তখন সে মনে মনে কবিকে ডেকে বলত—শিবঠাকুরের বিয়ের গান শোনাও, রঙিয়ে দাও, রসিয়ে দাও, কথা কও, কথা কও। কাশীর মহিষী করুণা স্নানে চলেছেন স্বচ্ছসলিলা বরুণায়, কী কৌতুকই কৌতুকময়ী করলেন, কতটুকু ক্ষতি হল তাঁর প্রজাদের। প্রভুবুদ্ধ লাগি অনাথপিণ্ডদ ভিক্ষা চাইলেন, মহাভিক্ষুকের সাধ পুরাইবে কে? মৈত্রমশায় সাগরসঙ্গমে তীর্থস্নানে যাবেন মোক্ষলাভের আশায়, মোক্ষদা হল সঙ্গী, সঙ্গ নিল মাসীর আদরে মানুষ দুরন্ত রাখাল, মায়ের রেগে বলা 'চল্

তোমে দিয়ে আসি সাগরের জলে' যখন সত্যি হলো তখন দেবতার গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য 'ফিরায়ে আনিব তোরে' বলে মৈত্রমশায়ের জলে ঝাঁপ বালকের স্বপ্নে, ধ্যানের টুকরোয় আঁকা রইল চিরকালের জন্য। আবার ওদিকে হোলি খেলছে হাজার রাজপুতানী, পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে জেগে উঠছে শিখ, বন্দা বন্দী হচ্ছে তুরানী সেনার করে, জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। মনে হত খুশির আমেজে, খোশ মেজাজে চেঁচিয়ে কবিতাগুলো হেঁকে হেঁকে লোক ডেকে শোনাই। যে দিনের গল্প বলছি, সে দিন বইখানা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লুম। নদীর ধারে দশানি ঘাটটা আমাদের মত ছিন্নবাধা পলাতক বালকদের একটা বিশেষ আশ্রয়ের স্থান ছিল—গঙ্গার ধার, স্নিগ্ধ বটচ্ছায়, প্রশস্ত চাতাল, ঝাউগাছগুলির মাথানাড়া, তাদের মর্মরধ্বনি, সবকিছু মিলিয়ে কেমন একটা উদাসভরা আবেশ আনত। সামনে ভরা নদীর কলোচ্ছ্বাস, শুভ্র চিকন জলে নানা বর্ণের দীপ্তি, দূরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আভাস। পাল তুলে তরতর করে নৌকো চলেছে, জেলেডিঙির মাঝিরা জাল পাতছে। বিরাট গাধাবোটগুলোকে টানতে টানতে নিয়ে গেলো ছোট্ট স্টীমলঞ্চগুলো। 'মোহিনী' গেল ঢেউ তুলে তরঙ্গভঙ্গে রঙ্গ করে, তন্বঙ্গী 'ললিতা' এল হেলে দুলে। এরা নিপুণিকা চতুরিকা নয়, 'নাজুকবদন' 'সিঙার' নয়, এরা হচ্ছে পোর্টকমিশনরের জাহাজ; রসিক কর্তৃপক্ষ নামকরণ করেছিলেন মন্দ নয়, ঘৃতাচী-মেনকা-রম্ভার মত সামান্যা এঁরা, বালক-চোখে অসামান্যা। তখন বড়বাজার থেকে এড়িয়াদহ পর্যন্ত স্টীমার চলত, কলকাতার বাবুরা সকালে বিকালে গঙ্গাবক্ষে হাওয়া খেতেন, চ্যাঙারি-ভরতি সন্দেশ, গোলাপজল-কেওড়া দেওয়া কুঁজো-ভরতি স্বপেয় জল আর মিঠে পানের খিলি ঘুরত হাতে হাতে বাত-ব্লাডপ্রেসার-ডায়েবি-টিসের প্রতিষেধক-রূপে। অবশ্য উপরতলার অহেতুকী ভাগ্যবান অভিজাতরা ছাড়াও হাটুরেরা এপার-গঙ্গা ওপার-গঙ্গা করত, উকীল, মোক্তার, কেরানী, ছাত্ররাও সহরতলী থেকে কলকাতায় যেত, আসত।

গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দেখি গোল হয়ে বসেছেন কয়েক জন, মুড়ি কাঁচা লংকা তেলেভাজা খাওয়া হচ্ছে খবরের কাগজ পেতে আর রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা পড়া হচ্ছে···ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে···দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া

দিতে পারি নাই। সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্র বিকীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাসব্রত-ধারী—তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত-অশোক-অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনে বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা যদি কখনো ঝড় আসে, দশ দিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব ঐ অবিচলিত শক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে··· জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে, যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ উদার, যাহা নির্বাক্, তাহারই জয় হইবে, আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি আমরা বর্ষে বর্ষে

মিলি মিলি যাওব সাগর লহরী সমানা

তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগ চর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখন সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না। তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে—

পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও

তিনি কহিবেন······

ভূমৈবসুখং নাল্পেষু সুখমস্তি

কথাগুলো তখনো সম্পূর্ণ বোঝবার ক্ষমতা আমার হয় নি, কিন্তু মন চন্‌মন্ করে উঠল, যেন সপ্তস্বরা বীণার একটি তারের ঝঙ্কার জাগিয়ে দিলে আমার শিরায়, রক্তে, ধমনীতে এক অতি পুরনো ঐতিহ্যের স্মৃতিকে। এ তো সেই কবিরই কথা যাঁর সুধাবাক্য আমি সেদিন সারা দুপুরবেলা আস্তে আস্তে নুন দেওয়া কাঁচা আমের মতো পরম পরিতৃপ্তিতে লেহন করেছি। যিনি পড়ছিলেন তিনি আমাদের পূজনীয় রতনদা—তখনকার দিনের একজন সৌম্যসহাস আদর্শবাদী তরুণ—আজও তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে দেশের ও দশের সেবায় কাটিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অমূল্য দিনগুলি—বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা।

বললেন—চলো না সব, বাচের নৌকো রয়েছে ঘাটে বাঁধা, রবী মল্লিক হালিও হাজির, দাঁড় টানতে পারবে না তোমরা? দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড়, কতক্ষণেরই বা পথ, সন্ধের আগেই ফিরে আসব। প্রচণ্ড লোভ হল—আমি তখন সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ, হাল, দাঁড় কিছুই বুঝিনা, হাত পা ছুড়ে, একটা ভেলার সাহায্যে গঙ্গায় নাইতে এসে সাঁতার শিখছি সবে। তাছাড়া বালীর পাশে বেলুড় তখনও আমার কাছে দুর্গম স্থান ছিল। দক্ষিণেশ্বরে অবশ্য দু'একবার গিয়েছি ঠাকুমা-পিসীমার আঁচল ধরে, দেবীদর্শনে। দেখে এসেছি এক পরম পুরুষের ব্যবহৃত খাট-বিছানা-খড়ম-কাঁথা, দেখেছি ভাঙা নহবৎখানা, পঞ্চবটীর আসন, শুনেছি ওখানে ভূত আছে অমাবস্যার মহানিশায় নিঝুম রাতে ভৈরব-ভৈরবীর নৃত্যবাসর বসে পঞ্চমুণ্ডীর শবাসনে, মহাপ্রকৃতি নাকি উন্মাদ হয়ে ওঠেন। শুনি নি শুধু একটি কথা যে ভূতভাবনও এখানে আছেন যিনি কাতরকণ্ঠে ডেকেছিলেন—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্. আয়,

> যিনি জগতচন্দ্র হার পরেছেন গলায়
> অশ্রুজলে সিক্ত করা প্রেমরসে ভাবন দেওয়া।

বাড়িতে নিষেধ ছিল—বিনানুমতিতে কোথাও যাবার—তায় আবার কালবোশেখীর দিনে ভরাগাঙে নৌকোয় করে। তবু লোভ হল জয়ী। জয় মা কালী বলে এপার-গঙ্গা ওপার-গঙ্গার মধ্যিখানে চর ডাইনে রেখে একঝাঁক কিশোর কিশলয়দল একনিমেষে নৌকোকে মাঝদরিয়ায় এনে ফেললে—বদর, বদর শুধু নয়—গান উঠল সম্মিলিত কণ্ঠে—আমাদের যাত্রা হল শুরু। পাঁচ মিনিটে আমরা পৌঁছে গেলুম, রাণী রাসমণির ঘাটে খরস্রোত জোয়ারের উজানে।

> ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার
> দিকে দিকে ঢেউ জাগল লীলার পারাবার
> আলোক ছায়া চমকিছে
> ক্ষণেক আগে ক্ষণেক পিছে
> আমার আঁধার ঘাটে ভাসায় নৌকা পূর্ণিমার
> ওগো কর্ণধার
> ডাইনে বামে দ্বন্দ্ব লাগে সত্যের মিথ্যার।

নারদ ভক্তযোগী, দেবর্ষি—হরিগুণ গান করে বেড়ানই তাঁর উদ্দেশ্য। বীণাহাতে তিনি ত্রিভুবন বেড়ান, মুখে কানু বিনা গীত নেই। ছয় রাগ

ছত্রিশ রাগিণীতে তাঁর বীণা বাজে—অনাহত স্বরে। তাঁর ধারণা তিনি শুধু সুরসিদ্ধ নন, স্বরসিদ্ধ, রাগরাগিণী তাদের রূপ, তাদের রস, তাদের বন্দেশ, তাদের বিস্তার, তাদের বিরতি, তাদের শিল্পকর্ম সবই তাঁর কণ্ঠায়ত্ত। একদিন তিনি একমনে ভজন করতে করতে চলেছেন—বীণায় বাজছে ষড়জঋষভগান্ধারের নানা ধ্বনি, অপরূপ রসে সিঞ্চিত হয়ে। হঠাৎ নজরে পড়ল বিকলাঙ্গ কতকগুলি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নারদ দয়াশীল, করুণা-কাতর মহাপ্রাণ, জিজ্ঞাসা করলেন—কে তোমরা, কেন তোমাদের এই দুর্দশা? তারা বললে—প্রভু আমরা ছয়রাগ আর ছত্রিশ রাগিণীর ভাবরূপ—নারদ বলে কে একজন সম্পূর্ণ অজ্ঞ সুরসাধক আমাদের বিকৃতরূপ প্রচার করছে। নারদ শুনে ভারী লজ্জিত হলেন—তাইতো, তাঁর নিজের বিচার-বুদ্ধিমত তিনি তাঁর গীতে অবিকৃত সুরই দিয়েছিলেন বলে তাঁর গর্ব কিন্তু এ কী—সত্যিই যদি রাগরাগিণীর অঙ্গহানিই করে থাকেন তাহলে তাঁর পূজা সুরলোকে সুরেশ্বরের কাছে পৌঁছয় নি। এতে যে প্রত্যবায় ঘটে, অপরাধী হতে হয়। ক্লান্তমনে চিন্তাকুল-চিত্তে তিনি চললেন বৈকুণ্ঠে। বৈকুণ্ঠাধীশ ভগবান বিষ্ণু বললেন—এসো, এসো, নারদ, ভক্তশ্রেষ্ঠ আমার, কিন্তু তোমার মলিন-বদন কেন? তোমার চিন্তার পিছনে কালো ছায়া কেন? নারদ বললেন—প্রভু আপনার অগোচর কিছু নেই, আমি যে আপনার স্তব গান করি, তার মধ্যে নাকি সুরের অসঙ্গতি রয়ে গেছে, অতএব আদেশ করুন, সে অপরাধের স্খালন হয় কিরূপে? নারায়ণ উবাচ—নারদ, আমি ভাবগ্রাহী জনার্দন, অন্তরঙ্গে তোমার ভাব আমি গ্রহণ করেছি কিন্তু বহিরঙ্গে তার স্বরূপকে তুমি উদ্ঘাটিত করতে পার নি।

তবে আমায় সেই শিক্ষা দিন।

মহাবিষ্ণু হেসে বললেন—ওর চরম অধিকারী আমিও নই, একমাত্র শিবই সেই পরমকে টেনে আনতে পারেন ধ্বনিতে নাদে। যাও কৈলাস-পতির কাছে—সেই "একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু র্য ইমাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ"। রুদ্রকে না রোদয়তি সংহরতি প্রলয়াদৌ রুজং সংসার দুঃখং দ্রাবয়তি ইতি।

নারদ এলেন কৈলাসে—স্তব করতে লাগলেন মহেশ্বরের—সেই তপো-যোগগম্য, শ্রুতিজ্ঞানগম্য মহাদেবতা রাজী হলেন—হ্যাঁ, তিনি গান করবেন কিন্তু সঙ্গৎ করবে কে? নারদ বললেন—কেন, আমি। মহাদেব বললেন—তা হয় না, গণেশকে বলো। নারদ গণেশকে রাজী করালেন। কিন্তু

সমঝদার কোথায়—নারদ বললেন—আমি বুঝব না প্রভু? শিব বললেন—না, বিষ্ণুকে খবর দাও। তখন আসর বসল ধ্রূপদের—গায়ক মহাদেব, বাদক গণেশ আর সমজদার স্বয়ং নারায়ণ—অলক্ষ্যে নেপথ্যে এলেন ব্রহ্মা ও দেবগণ—আর বিস্ফারিতনেত্রে শ্রবণ করতে থাকেন নারদ। নাদব্রহ্ম স্বয়ং উৎসারিত হল মহাদেবের কণ্ঠ থেকে। শুনতে শুনতে নারায়ণ রসে দ্রবিত হয়ে উঠলেন, তাঁর পদযুগল গলতে সুরু করল। বিষ্ণুপাদোদ্ভূত সেই জল ব্রহ্মা কমণ্ডলুতে ধারণ করলেন—সুর আর ধ্বনির মিলিত চাপে সৃষ্টি হল সুরধুনীর। হরিপাদপদ্ম তরঙ্গিণী গঙ্গে হিমবিধু মুক্তা ধবল তরঙ্গে। বাল্মীকি বললেন—অভিনব-বিসবল্লী (নবীন মৃণাল) পাদপদ্মস্য বিষ্ণো র্মদন মথন মৌলেঃ মালতী পুষ্পমালা। হিমালয়ের কোল থেকে একদিন কুক্ষি ভেদ করে লাফ দিয়ে পড়লেন তিনি। গৌরীভ্রূক্ত ভ্রূকুটি সত্ত্বেও জটিল, জটা জাল ভেদ করে জাহ্নবীকে শিরে ধারণ করলেন শংকর। তাই তো নাম হল তাঁর গঙ্গাধর। হরজটাভ্রষ্ট ভাগীরথী "শূলোঃ কেশ গ্রহণমেবাদিন্দু লগ্নোর্মিহস্তা" হয়ে বেয়ে চললেন সগর পুত্রদের উদ্ধার করতে।

॥ তিন

সেদিন মন্দিরে ঢুকে কি মনে হয়েছিল আজ তা মনে থাকবার কথা নয় তবু ক্ষীণ স্মৃতিতে এইটুকু জাগে যে একটা ঘন অনুভূতি নিয়েই ফিরেছিলাম, সেদিন তো ভাবি নি যে এইখানেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, আবিষ্কৃত হয়েছিলেন, স্বীকৃত হয়েছিলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, এখানেই নরেন্দ্রনাথ বলে একটা দামাল ছেলে জিজ্ঞাসা করেছিল—দেখাতে পারো, পারি;—জানো, জানি। এইখানেই উদ্ভব হয়েছিল এক নব ভাব গঙ্গোত্রীর, এক রসসঞ্জীবনী প্রাণবন্যার, এখানেই তিনটি ধারা মিশেছিল—প্রাচীন ভারতবর্ষের ধ্যান ও মন, তার সংহতি ও সংযম, পশ্চিমের ধাক্কা-খাওয়া চেতনার সংশয় ও সন্দেহ, সংকল্প ও সাধন, আর, ভবিষ্যতের সমন্বয় ও সিদ্ধির আভাস। যাঁরা মনে করেন যে এখানে শুধু গড়ে উঠেছিল একটা দেবতার দেউল বা ধর্মসাধনার মন্দির বা সম্প্রদায় বিশেষের আস্তানা তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর যুগ চেতনার ইতিহাসকে ভুলে যান—তাঁর

যাই হোক্ গঙ্গায় দুবার এবং যমুনায় একবার (মথুরার বিশ্রাম ঘাটে) ডুবতে ডুবতে বেঁচেছি এ কথা সত্য। কালিন্দীর তীরে ডুবিব ডুবিব সখী নিশ্চয়ই ডুবিব বলে আমি ডুবি নি—রামানুচর পরম পূজ্য এক বানরই এই অধম নরকে 'উত্তমঙ্গেন বন্দেহং' যমুনার জলে গলাধাক্কা দিয়েছিলেন আবার বাঁচিয়েছিলেন কূর্মাবতারের এক অবতংস। যমের ভগিনী যমুনা সেদিন দুগ্ধাহুতি পেয়েছিলেন প্রচুর, কৃতজ্ঞ আত্মীয় স্বজনের কাছে, সে কথা স্মরণ আছে। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা, পরম রূপলাবণ্যবতী—আদিত্য তার স্বামী, পুত্র যম, কন্যা যমুনা। এ যেন প্রাচীন অসিরিস্ কাহিনী। যমুনার চপলতায় যম তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন—তুমি মর্ত্যে যাও—গঙ্গার সঙ্গে রেশারেশি তার, শিবকে সেও চায় পতিরূপে। শিব এসে দাঁড়ালেন যমুনার তীরে—তার গৌরতনু রজতশুভ্র দেহকে নিজের কোলে টানবার ইচ্ছা হল যমুনার। শংকরও নামলেন যমুনার জলে অবগাহনের জন্য। কলহাসিনী কলস্বনা স্বৈরিনীর মত তাঁর অঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুরন্ত বিলাসে শত তরঙ্গভঙ্গে। ধূর্জটির জটাজাল ভেদ করে তাঁর তৃতীয় নেত্র উঠল জ্বলে রুদ্রতেজে, যমীর অঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে গেল—নাম হল কালিন্দী। শঙ্কর তার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলেন—গঙ্গার ধারায় মিশিয়ে দাও তোমার বর অঙ্গ—তাহলেই পাবে আমাকে—আর তোমার তীরে তীরেই উঠবে প্রেমের স্বপ্ন—কালিন্দীর কূলেই জলবিহার করবেন স্বয়ং বিষ্ণু—তুমি স্নিগ্ধ হবে তাঁর গোপীলীলায়, তাঁর কালিন্দী সলিল কান্তি কলেবর কৃতকুসুমাবলি বেশে।

যম-যমী সংবাদ মুলতবী থাক্—ততক্ষণে মঠের সন্ন্যাসীরা দৌড়ে এসে পড়েছেন—তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন ওপরের বারান্দা থেকে যে একটি ছেলে জলে পড়ে গিয়েছে। প্রকৃতির তাণ্ডবতাও কমে এসেছে। আধঘণ্টার মধ্যেই ছেঁড়া মেঘের আড়ালে অবসাদ গোধূলির ধূলিজাল পেরিয়ে অস্ত তপনকে ক্ষণিক দেখা গেল চকিতে—করুণ রবি মলিন হেসে চলে যাচ্ছেন শেষ বিদায়ের রশ্মি ফেলে। সিক্তবসন আমাকে সাময়িকভাবে পরবার জন্য একটা সাদা কাপড় আর গৈরিক গামছা এনে দেওয়া হল। আজ ভাবি সেদিন সন্ন্যাসীদের গৈরিকের ক্ষণিক স্পর্শ তো লেগেছিল। অবশ্য তখন আমি সদ্যঃ উপনীত ব্রাহ্মণসন্তান—সযতনে ত্রিসন্ধ্যা করি গায়ত্রীছন্দসাং মাতঃ, ব্রহ্মযোনিকে নমস্কার করি, অর্বাচীনের মতো বুঝতে চেষ্টা করি কোন্ সবিতার কথা ঋষিরা বলেছেন সাবিত্রী মন্ত্রটা কি।

তৎসবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

বেশী বয়সেই আমার পৈতা হয়েছিল আর আমার এক পিতৃব্য মন্ত্রগুলির অর্থ বোঝাবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন সে কথা মনে আছে— তবু বুঝি নি বেশি কিছু। আকাশে জলজল করছে এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড— লক্ষ কোটী কোটী বৎসর ধরে সে গড়ে উঠেছে, আলো দিচ্ছে, তাপ দিচ্ছে, তারই প্রতিফলিত ছায়ায় চন্দ্র হচ্ছে স্নিগ্ধ, পৃথিবী হচ্ছে শস্যমালিনী, জায়া ও জননী, এইটুকু পর্যন্ত বোঝা যেত আমাদের স্কুল কলেজের বিজ্ঞানের পাঠ থেকে। কিন্তু এই রূপক ও প্রতীক নিয়েই এক জবাকুসুমসংকাশ মহাদ্যুতি দেবতাকে আমরা বিশ্বের প্রসবিতা বলে কল্পনা করেছি এ বোধ তখনও চেতনায় আসে নি কিন্তু প্রাণপণে মুখস্থ করেছি ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্র—

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।

বুড়োবয়সে জেনেছি এটা হচ্ছে ঋগ্বেদেরই মন্ত্র, সৃষ্টিসূক্তের অংশ। স্বামীজীরা আমাদের নিয়ে গেলেন আদর করে। দেখলাম সান্ধ্য আরতি—

ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকা আগে

সুরে সুরে স্বরে লয়ে ধূপধুনো আলোর মধ্যে একটা করুণাঘন প্রজ্ঞাঘন প্রেমঘন mellowed মূর্তির আভাস এল। কৈশোরের সেই অবর্ণনীয় চেতনার কথা আজ কল্পনায় টেনে আনতে হয়। দেখলাম স্বামী বিবেকানন্দের ঘর। এইখানেই এমন এক বর্ষণক্লান্ত স্তিমিত সন্ধ্যায় (জুলাই ১৯০২) শেষ ধ্যানে বসেছিলেন স্বামীজী দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে। কণ্ঠে ছিল শুধু মৃদু ভাষায়—শিব, শিব। সেই শিবই আজ মহান মৃত্যুর বেশে এসে মহাবরষার রাঙা জল ভেদ করে তাঁর তরণীকে পার করে নিয়ে গেল

তব পিঙ্গল ছবি মহাজট
সে কী চূড়া করি বাঁধা হবে না?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কী আগে-পিছে কেউ বহবে না?

তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরণ?

সেদিন দেখা হয়েছিল আর-একটি পুণ্যশ্লোকা মহিলার সঙ্গে—মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্লাউড—বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্যা 'জো'। বহুদিন পরে পড়েছিলাম সেই চমৎকার চিঠিখানি—জানো, জো, দক্ষিণেশ্বরের বটবৃক্ষতলে যখন অভিভূত স্তব্ধ হয়ে রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব কথাগুলো শুনতাম, তখন তো আমি বালক। সেই তো আমার সত্তা—আর যাকিছু সবই এহ্ বাহ্য। আজ আমার মৌনী মন আবার সেই কথাই শুনছে—সেই পুরনো দিনের মন-মাতানো, প্রাণ-ভোলানো কথা—কি মধুর, কি অপূর্ব—সব বাঁধন ভাঙছে, প্রেম মরছে, কাজে আর স্বাদ আসছে না, জীবনের দ্যুতি যেন নিভে আসছে—

এ যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

ডুবে যাবার সুখে আমার
ঘটের মত যেন অঙ্গ ওঠে ভরে

হ্যাঁ, আমি আসছি—সামনে নির্বাণের মহাসমুদ্র, সম্মুখে সেই শান্তির পারাবার—বায়ুহীন তরঙ্গহীন স্তব্ধ—সেই স্রোতস্বতীর তপ্ত স্রোতে আমি ভেসে চলেছি—হাত পা নাড়তে ইচ্ছে করছে না—এমন এক অপূর্ব শান্তি। এ কী মায়া না মতিভ্রম না ভ্রান্তি না পরম আস্বাদ। তার পরে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন

Behind my work was ambition, behind my love was personality, behind my purity was fear, behind my guidance the thirst for power. Now they are vanishing and I drift. I come, Mother as spectator no more an actor.

আমার কাজের পিছনে ছিল উচ্চাভিলাষ, আমার ভালবাসার পিছনে ছিল ব্যক্তিত্বের প্রেরণা, আমার পবিত্রতার পিছনে ছিল ভীতি, আমার চালকগিরির পিছনে ছিল ক্ষমতার লিপ্সা—এখন সব ভেসে যাচ্ছে মা—মা আমি আসছি—এবার শুধু দ্রষ্টা—আর অভিনয় নয়।

॥ চার

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীকাব্যে ধনপতির বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় লিখেছিলেন

ত্বরায় বহিছে তরি তিলেক না রয়
চিৎপুর শালিখা সে—এড়াইয়া যায়

শালিখার চৌমাথায় এলেই মনে পড়ে যায় যে এই ঘুশুড়ির বাঁকেই ভোটবাগানের মন্দিরে ইতিহাসের এক লুপ্ত অধ্যায়ের অবহেলিত স্মৃতি লুকিয়ে আছে। বেশী দিনকার কথা নয় তবু কথা কইছেন মুনি অতীত। ধ্যান ভেঙে কথকতায় বসেছেন সন্ধেবেলায়—নিভু নিভু প্রদীপের ছায়ায় আবছা আলো অন্ধকারে ভেসে উঠেছে ইতিকথার মায়ামদির রেখাগুলি। খরস্রোতা নদী পেরিয়ে শালিখার ধারে ঘুসুড়ির বাঁকে গৈরিক কষায়বস্ত্র পরিহিত এক তপ্তকান্তি সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন উত্তরের দিকে চেয়ে—চোখে স্বপ্নে ভাসছে হিমকুন্দ-তুষারশীর্ষ নগেশের চেহারা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ—তিব্বত, কৈলাস, মানস। জ্ঞানপিপাসু তরুণ পরিব্রাজক, ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিব্বতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। পরিচয় হয়েছিল প্রধান লামার সঙ্গে—তাসীলাম্পোর তাসী বা পাঞ্চেন লামা—তিনি মঞ্জুশ্রীর অবতার, চীনসম্রাটের মন্ত্রদাতা গুরু, বুদ্ধ অমিতাভের মূর্ত প্রতীক, যাঁর অমিত আভা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে—বজ্রগর্ভ মহাবোধিসত্ত্ব, যিনি অক্ষোভ্য, ক্ষোভ নেই যাঁর। লামা বলেছিলেন, দুঃখময় এ সংসার, তনহা রাক্ষসী রূপ ও নামের মধ্য দিয়ে সংস্কার ও পুদ্গলের মাধ্যমে আনছে তৃষ্ণা, আসছে বেদনা, আসছে কামনা। চিত্ত কুশলশীল নয়, চিন্তা সুভাবনাযুক্ত নয়, বাক্য সুভাষিত নয়, দুঃখময় এ সংসার—সম্যগ্ দৃষ্টি নেই, সম্যগ্ সংকল্পের অভাব, বহুকল্পদুর্লভা বোধি নেই। মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা মহাগুরুর নির্দেশ। ইহাসনে শুষ্যতু শরীরং বলে ত্বক্ অস্থি, মেদ মাংসের উৎসর্গ নয়, শরণ নিতে হবে সেই বোধির, সেই জীবনবেদের, সেই সংঘশক্তির, তবেই আসবে অনাসক্তি, অপ্রমাদ—এই তো শাস্তার শেষ বচন—পচ্ছিমা বাচা। তিনি শুধু লোকোত্তর নন লোকনাথও। তাই তিব্বতে আমরা তাঁকে খুঁজেছি মানুষের বিভূতির মধ্য দিয়ে, শক্তির পথে, ভুক্তির মন্ত্রে, তন্ত্রের আশ্রয়ে, মহাযান, বজ্রযান, কালচক্রযানের তত্ত্ব দিয়ে—বাংলাদেশের কাছেই আমাদের এই শিক্ষা—এই গুহ্যসাধনার পীঠস্থান ঐখানে। তিনি আরো

বলেছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যকে—দেখ ফিরে যাও তুমি বাংলাদেশে—বড্ড ভালবাসি আমি ঐ নদীমেখলা শস্যশ্যামলা মাটিকে—ঐখানেই আমি দু'বার জন্মগ্রহণ করে কায়া পরিবর্তন করে নিয়েছি—আমার বড় ইচ্ছা গঙ্গার তীরে একটি মঠ, একটি মন্দির স্থাপিত করি—ভারতের জ্ঞান ও তিব্বতের বিজ্ঞান মিলিত হয়ে একটি নতুন সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে তুলুক। জগদুপকৃতিই তাঁর পূজা, 'তদপকৃতি স্তব লোকনাথ পীড়া' জগতের অপকার করাই তাঁকে পীড়া দেওয়া।

এ কাহিনী ইতিহাস ডিঙিয়ে বেড়া ভেঙে সুদূর যুগান্তরের গল্প নয়—এ হচ্ছে প্রায় আজ-কাল-পরশুর কথা—দুশো বছরও হয়নি। ইংরেজ সবে জব চার্নকের চৌকিতে বসে বাদশার দেওয়া দেওয়ানী নিয়ে রঙের তুরুপ খেলছে, বৈঠকখানার বটযক্ষিণীদের ডেকে বলছে—রসবন্ধং দদস্ব মে। তারা জাহাজ ভরতি করে নিয়ে যাচ্ছে সওদা, পকেট ভরতি করে পণ্যবাহী সভ্যতার পুণ্য মুনাফা—মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার। তারই কলরোলে সাগরপারে উঠছে ভারতফেরতা নবাবদের প্রাসাদ, আর শিল্পবিপ্লবের আমন্ত্রণ আর এপারে তাদেরই প্রসাদপুষ্ট তাঁবেদার সাকরেদ বেনিয়ান দালাল মুৎসদ্দি নায়েব গোমস্তার হুঙ্কার। ততদিনে ফিকে হয়ে এসেছে বোম্বেটে হার্মাদদের হল্লার খবর, আর্মেনিয়ান রূপসীদের জেল্লার কাহিনী, হাবসী-ক্রীতদাসীদের হা-হুতাশ, নিমকীর চৌকির গল্প, ভোররাতে বাগানবাড়ি ফেরত নতুন বাবুদের পাল্কীর হুমহাম আর ঘোড়ার খুরের কদম কদম শব্দ। দেখতে দেখতে বজ্রবাহী বাদাবনে বেতের জঙ্গল চিরে দক্ষিণ রায়ের রাজত্ব ছোট থেকে ছোট হতে থাকে—গোবিন্দপুর সুতোনুটী ডুবু ডুবু, কালিঘাট ভেসে যায়, প্রমত্তা হয়ে ওঠে কলকাতা। সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে যাদের আগমন তারা ভোগবতীর ভৃঙ্গার ভরে নিতে জানে ভাগীরথীর জলে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার শিহরণ লাগে, দিল্লীশ্বরের সিংহাসনে তার কাঁপন জাগে, ভিত্ নড়ে, ফাটল ধরে। দিল্লীর রঙ্গশালার রংমহলের শিশমহলের কক্ষে কক্ষে বাতি নেভে, চাঘতাই মুঘলবংশের ইমারত জহরত মাটিতে লুটোয়। মকরধ্বজ, মৃগনাভিতেও নাভিশ্বাস বন্ধ হয় না। কানে শোনানো হয় তারকব্রহ্ম নাম, নয় হরহর মহাদেও, গুরুজী কি ওয়া। আবদালী দুরানী রোহিলাদের চীৎকারে দৃপ্ত আস্ফালন। ভোর হল যেই শ্রাবণ শর্বরী, দেখা গেল বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগ্বলয়ে।

আর আমরা

বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা,
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব—
ভাটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা।

এমনি দিনে (১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে) কলিকাতার সুরম্য লাটপ্রাসাদে দামামা বেজে উঠলো—প্রবলপরাক্রান্ত মহামান্য গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বাহাদুর তিব্বতের দূতদের সাদরে অভ্যর্থনা করছেন—তাঁরা আসছেন তাসী লামার পত্র নিয়ে গিরিদরি বেয়ে আমাদের কল্পনার অভেদাঙ্গ হরগৌরীর হিমমন্ডিত আবাস থেকে। মহাকবি মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বসাক লিখলেন : আমরা কল্পনা করতে পারি বড়লাট বাহাদুরের মন্ত্রণাকক্ষে দণ্ডকমণ্ডলুধারী অজিনস্কন্ধে সন্ন্যাসীর প্রবেশ। এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এই প্রবন্ধ হয়েছিল লেখা।

তিব্বত থেকে এই যে 'মিশন' এল তার কারণ যে হিমালয় থেকে দলে দলে ভোটরা এসে কুচবিহার আক্রমণ করে। মহারাজা কোম্পানীর শরণাপন্ন হন এবং তাদের সৈন্যসামন্ত এসে হানাদারদের তাড়িয়ে দেয়। খবর গেল তাসী লামার কাছে তিব্বতে। জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত অনেক ভেবে চিন্তে পত্র দিলেন হেস্টিংসের কাছে, এক সম্মানজনক সন্ধির প্রস্তাব করে—লামার দূত হয়ে যিনি এলেন তাঁর নাম আচার্য পুরাণগির গোঁসাই বা পূর্ণগিরি গোস্বামী।

লামা লিখলেন : ভূটানের দেবরাজা আমার অনুগত—তাকে আমি ভর্ৎসনা করেছি যে এরূপ অত্যাচার আর সে না করে, আপনিও আর তাকে কোনরূপ উৎপীড়ন করবেন না—আপনি প্রবল পরাক্রান্ত, আমি ভগবান তথাগতের একজন দীন সেবক—ধরিত্রীর প্রত্যেক জীবেরই কল্যাণ কামনা করাই একমাত্র কাম্য—মালা জপ করতে করতে আমি প্রার্থনা করি—ওঁ মণিপদ্মে হুম—শান্তি, শান্তি।

ওয়ারেন হেস্টিংস দেখলেন যে এই সুযোগে ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু সুযোগ-সুবিধা করে নেওয়া যায় কিনা। ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি জর্জ বগোল (Bogle) নামে এক ইংরাজের নেতৃত্বে একটি 'মিশন' পাঠালেন—সঙ্গে রইলেন আচার্য পূর্ণগিরি। কাউন্সিলের মিনিটে পড়ি ওয়ারেন হেস্টিংস লিখছেন যে, তিব্বতের সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তার অনুসন্ধান করতে হবে এমন কি flora fauna এবং সামাজিক তথ্যও, যেমন বহুপতিপ্রথা। আর এই সময়েই লামা তাঁর প্রিয় শিষ্য পূর্ণগিরিকে গঙ্গার তীরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার ভার দিলেন। হেস্টিংসকে সে বিষয়ে চিঠিও লিখলেন : Persian Records-এর ইতিহাসে

এই লাখেরাজী বন্দোবস্তের হিসাব নিকাশ পাওয়া যায়—প্রায় দেড়শো বিঘে জমি। চীন থেকে সংগৃহীত তারা মূর্তি এল—প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতীক হিসাবে। ভিত্তি হল ভোটবাগানে মহাকালের মন্দির প্রতিষ্ঠায়। মূর্তি রইলেন সম্ভবচক্র, সমাজগুহ্য, পদ্মপাণি, বজ্রভ্রূকুটি। তার পরে দেখি রয়েছে শালগ্রাম শিলা, বিন্ধ্যবাসিনী, শিব-শিবানী, আলিঙ্গিত শক্তি দেবতা, আনন্দক্ষণ ভেদনের রূপে।

তখনকার দিনে এই ধরনের পরিব্রাজক দলের কয়েকটির ঐতিহাসিক সন্ধান পাওয়া যায়। তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গে লিপ্ত থাকতেন। তৃতীয় তাসী লামার আত্মজীবনীতে (তিব্বতীয়) এরূপ গোস্বামী কৃষ্ণপুরী, লালা কাশ্মিরীমল, শোভারাম প্রভৃতি কয়েকটি তারতীয়ের নাম পাওয়া যায়। কাশীরাজ চৈৎ সিং-এর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল—তিনি সারনাথে, গয়ায় দূতসহ পূজা পাঠিয়েছিলেন, এও ঐতিহাসিক তথ্য। তিব্বত গমনের পথগুলি ঐ পরিব্রাজকদেরই জানা ছিল।

চার বৎসর পরে হেস্টিংস আবার একটি 'মিশন' পাঠান চীনসম্রাটের সঙ্গে যাতে কোম্পানীর সৌহার্দ্য পাকাপাকি হয় লামার মধ্যস্থতায়। ঐ সময়ে লামার আমন্ত্রণ এসেছিল মহাচীন যাত্রার। স্বয়ং সম্রাট তাঁর দর্শনা-কাঙ্ক্ষী। আচার্য পূর্ণগিরি হলেন সঙ্গী। লামা কিন্তু বলেছিলেন যে, এই তাঁর শেষ যাত্রা। সত্যিই তিনি দেহরক্ষা করেন এক নিদারুণ রোগ মারী-গুটিকায়। তার পূর্বেই তিনি সম্রাটকে মন্ত্র দান করেন এবং পূর্ণগিরির বিবরণীতে (যা তিনি হেস্টিংসকে দিয়েছিলেন ১৭৯১ সালে এবং ১৮০৮ সালে প্যারিসে প্রকাশিত হয়েছিল) তার সম্পূর্ণ ছবি পাই। তিব্বতীয়দের ধারণা যে, লামারা অজর অমর, তাঁরা মরেন না—মৃত্যু মানে 'দেহ-দেহান্তর প্রাপ্তি নব এব মহোৎসব'। তারা শুধু কায়াটা বদলে নেন—কোন সদ্যোজাত শিশুর দেহে তাঁদের আত্মা সঞ্চারিত হয়—তিনি হন নবকলেবর প্রাপ্ত—উত্তাষ্ঠাৎ পুনর্নবঃ। শিশু লামার প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে হেস্টিংস আবার পূর্ণগিরিকে পাঠান ক্যাপ্টেন টার্নারের সঙ্গে। টার্নারের কাহিনীও অনেক অদ্ভুত কথা শোনায়। কলিকাতা থেকে চতুর্থ 'মিশন' যায় ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে। এবারে আচার্য পূর্ণগিরিই নেতা—ভারতের আধুনিক কালে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা তাঁরই। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন হেস্টিংস বিলাতে চলে গেছেন—ম্যাক্‌ফারসন্ অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল। তাঁরই হাতে রিপোর্ট পেশ করা হয়। তারপর থেকে

পার,

পূর্ণগিরি ঐ ভোটবাগানের মঠেই স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর খ্যাতি, তাঁর নিরলস সাধনা দেশ-বিদেশের প্রণাম কুড়িয়ে আনে—স্থানটি তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। স্বয়ং গভর্নর জেনারেলও মঠাধীশের সঙ্গে এসে আলাপ-আলোচনা করতেন। তারপর ১৭১৭ শকাব্দে (ইং ১৭৯৫) ২৩শে বৈশাখ গভীর রাত্রে দস্যুদল মঠ আক্রমণ করে এবং আচার্য পূর্ণগিরি নিহত হন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্নওআলিসের কাছে এ খবর প্রেরিত হয়। বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বদের আধার হেবজ্রের বজ্র তাঁরই উপর পড়ে।

বুদ্ধানাং বোধি সত্ত্বানাং আধারং বজ্রধারিণাম্
এবং এব তু সংসারম্ নির্বাণম্ এবং এবতু।

॥ পাঁচ

ভাবছি, আজকের কলকাতায় বসে কালকের কলকাতার কথা মনে করতে কেমন লাগে, যে কাল গেছে চলে। কাকে ডেকে বলব—কথা কও, কথা কও। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, হারিয়ে গেছে জব চার্নকের কলকাতা আর জন কোম্পানীর দিন। বটযক্ষিণীর আওতায় বসে বৈঠকখানা বাজারে গুড়গুড়ি টানতে টানতে বেচাকেনার ভ্রষ্ট লগ্ন আর আসে না, যেমন আসে না সুন্দরী বিধবার 'সতী' হতে হতে সাহেবের অঙ্কশায়িনী হওয়া। তবু এককালের মৃগলাঞ্ছিত পার্ক স্ট্রীটের শেষ কোণায় আজও বিদ্রোহীদের আস্তানা আছে, হয় তো গভীর রাতে আসর বসে কবরখানায়। সেসব দুরন্তদিনের ইতিহাস আজ স্তিমিত। কবিকংকণের ধনপতির বাণিজ্যযাত্রায় দেখি 'কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা বেতড়তে উত্তরিল অকাল বেলা' এখানে কলকাতার উল্লেখ প্রক্ষিপ্ত কিনা বলা যায় না তবে

ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান দুই কূলে বসাইয়া বাট
পাষাণে রচিত ঘাট দু কূলে যাত্রীর নাট, কিঙ্করে বসায় নানান

এও পড়ি। আরও পড়ি নবাব বাহাদুর কা ফৌজ 'যৈসি খোলা তলোয়ার ঘড়ি ভরমে জিতলিয়া কেল্লা কলকাত্তা রাজ্জার।' অবশ্য এটা লেখা ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে নবাবের কলকাতা অভিযানসম্পর্কে। অবশ্য কালীঘাটের নাম

পাওয়া যায় বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলে, রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গলে। আর চৌরঙ্গী ছিল তো বন, সেখানে থাকত বিগ গেম্, ছিল জঙ্গলগীরের আস্তানা, ডাকাতদের আড্ডা। মনে করতে মজা লাগে যে আজকের ক্যামাক স্ট্রীট এলাকায় ছিল ডিয়ার পার্ক—হরিণনয়নারা নন, খাস হরিণ-হরিণীরাই খেলা করতো সেদিন। ফ্যানি পার্কস্ তার গল্প লিখছেন, জেন্টলম্যান এটর্নী উইলিয়ম হিকি 'ট্যাভার্নে' গিয়ে পেটপুরে চমৎকার মাছ, চলনসই মুরগি, প্রচুর ডিম বেকনের সঙ্গে বোতল বোতল ক্ল্যারেট্ উড়িয়ে দ্রাক্ষারসসিঞ্চিত হয়ে ভাবে গদগদ হয়ে উঠছেন—ওদিকে নর্তকী 'নিকি' নাচছে, বেলজিয়ান শিল্পী সলভিন্স আমাদের ছবি আঁকছে। হুকাবরদার, হরকরা, পেয়াদা, তামাক খাওয়ার দৃশ্য এ সবের স্মরণীয় চিত্র রেখে গেছেন এই পরদেশী শিল্পী যাঁর অ্যালবাম এক সময়ে একশো গিনি মূল্যে বিক্রী হয়েছে। তাঁর *Les Hindous* বলে প্যারিসে প্রকাশিত সংস্করণটির আটটি পরিচ্ছেদ। কালিঘাটের মন্দিরের ছবি থেকে কলকাতায় কালবোশেখীর ঝড়ের দৃশ্য, নারীদের পোশাকের ছবি, গঙ্গায় বান আসছে, উৎসব পার্বণের দৃশ্য কিছুই বাদ দেন নি সলভিন্স। দেখতে দেখতে কলকাতা হয়ে উঠেছিল কলকলিতা, রঙ্গে ভরা বঙ্গদেশে নতুন মালিকেরা জেঁকে বসল। যৌবনবতী কলকাতা বরণ-ডালা হাতে তাকে বরণ করে নিলে। আজ তার প্রথম যৌবনস্ফীত দিনের কথাই বলি একটু-আধটু—বেশিদূর পেছিয়ে না গেলেও চলে। একশো ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার কলকাতা গেজেটের পাতাগুলো উল্টে যান—দেখবেন কতো কথাই না ভেসে উঠছে আজকের এই মরা গাঙে জলজ্যান্ত হয়ে, কত রং বেরংএর মজাদার গল্প আর কাহিনী। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা মার্চ থেকে এই গেজেটের পত্তন। শুধু কি মহামান্য কোম্পানীর দপ্তরের খোশখবরই থাকত, তা তো নয়, বেসরকারী কত জব্বর খবরও, অর্থাৎ সেকালে গেজেট কাজ করত একেলে 'নিউস্‌পেপারের' বা খবরের কাগজের। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন, বিচার, বাণিজ্য, সামাজিক রীতিনীতি এমনকি সাহিত্যিক প্রচেষ্টারও টুকরো-টাকরা খবরও পাওয়া যেত এই গেজেটে। সরকারের খবর থাকত, সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকত, বিজ্ঞাপন থাকত, অন্য কাগজ থেকে উদ্ধৃতি থাকত, নানা মজাদার খবর থাকত, মোটের উপর ফুটে উঠত একটা নিটোল চিত্র। ১৮২৬ থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত খবরের এইরকম একটা সংকলন সম্প্রতি রাজ্যসরকারের আনুকূল্যে বেরিয়েছে। পূর্বেও ব্রিটিশ যুগে সেটন্‌কার,

স্তাণ্ডিয়্যান্ প্রভৃতির সম্পাদনায় কয়েক খণ্ড বেরিয়েছিল। ১৮৩২ সালের পর সরকারী খবর ছাড়া গেজেট আর কোনো সংবাদ পরিবেশন করত না। কোম্পানীর রাজত্বের এই যুগটা একটা বিরাট আলোড়নের যুগ। কলকাতা কাঁপছে, দুলছে, ফুলছে, শুধু বাইরেই নয়, মনেও। শ্রীঅরবিন্দের কথা মনে পড়ছে—a society electric with thought and loaded to the 'brim with passion, এই যুগেই দেখছি আমরা রামমোহনকে, দ্বারকানাথ ঠাকুরকে, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংককে, মেকলেকে, উঠে যাচ্ছে সতীদাহ প্রথা, বিদায় নিচ্ছে ঠগীরা, পিণ্ডারীরা। খোলা হচ্ছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল; শোনা যাচ্ছে বেদান্তের বাণী, একেশ্বরবাদের কথা। সুপ্রীম কোর্ট গ্র্যাণ্ড জুরীকে ডেকে আইনের নূতন ব্যাখ্যা করছেন। একটা নির্ভীক প্রেস গড়ে উঠছে; হোরেস উইলসন্ অনুবাদ করছেন মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, মুদ্রারাক্ষস। বেঙ্গল অ্যানুয়ালে বেরুচ্ছে সর্বস্ব পুরাণের অনুবাদ এসিয়াটিক সোসাইটিতে গবেষণা হচ্ছে। চৌরঙ্গী থিয়েটারে অভিনয়—The Wheel of Fortune, the Blind Boy, Liar প্রভৃতি নাটক। বৈঠকখানা থিয়েটারে A Lesson for Lovers, My Lady's Gown—দেখান হচ্ছে ওয়াটলু´ যুদ্ধের চিত্রপ্রদর্শনী। তখনি কলকাতার নাম হয়ে গেছে City of Palaces, ১৮২১ সালের এক গেজেটে "জনবুল" থেকে কলকাতার নানা উন্নতির কথা উদ্ধৃত হয়েছে। কলিকাতা উন্নয়ন কমিটি (Committee for improving the Town of Calcutta) বলে একটি প্রতিষ্ঠানও ছিল। আমরা পড়ি যে ১৮২১ সালে তাঁরা ধর্মতলায় একটি নতুন বাগান রচনা করছেন 'with the street passing along to western side to the Bow Bazar.'—অনুমান করছি আজকের ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও তৎসংলগ্ন স্কোয়ারের কথাই বলা হচ্ছে। আমরা পড়ি বৌবাজার থেকে চিৎপুর পর্যন্ত আর একটা রাস্তার কল্পনাও। ডালহৌসী স্কোয়ারের নাম তখন Tank Square। ঐ সময়েই রাইটার্স´ বিল্ডিংএর নূতন রূপায়ণ হয়। একটা নূতন কাস্টম হাউসও তৈয়ারি হয়। ১৮২২ সালে 'জনবুল' কলকাতার জনসংখ্যা স্থির করেন—খ্রীস্টান ১৩,১৩৮, মুসলমান ৪৮,১৬২, হিন্দু ১,১৮,২০৩ আর চীনা ৪১৪,—মোট ১,৭৯,৯১৭। অথচ ১৮১৪ সালের অন্য এক হিসাবে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটরা ৭ লক্ষ লোকের গণনা দিয়াছেন। কলকাতায় নাকি সেইযুগে ৬৭,৫১৯টি বাড়ি ছিল, তার মধ্যে দোতালা ছিল ৫,৪৩০, একতালা ও টালি ছিল ৮,৮০০ আর ১৫,৭৯২, গোলপাতার আর খড়ের

কুঁড়ে ছিল ৩৭,৪৯৭। আজ থেকে একশো চল্লিশ বছর আগেও অর্থাৎ ১৮২২ খ্রীঃ অব্দেও দেখছি যে বাজারে ভালো মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। গভর্নমেন্ট কমিটি সংগঠন করছেন "To examine into the state of the Calcutta Fish market and report upon the possibility to improvement." ১৮২৮ সালে দেখছি সমুদ্রের মাছ ধরে সাগর দ্বীপে ঘাঁটি করে কলকাতার বাজারে ছাড়া যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই রিপোর্টে মাছের ব্যবসায় কাদের হাতে, কোথা থেকে সরবরাহ আসে, জেলে, নিকারী, হালদার, পাইকাররা—কে কত লাভ করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। কলকাতায় তখন দেখি চোদ্দটি মাছের বাজার—মেছুয়া বাজার, লালাবাবুর বাজার, শিমলের, কাশীনাথ বাবুর, রাজা সুখময়ের পোস্তায়, কাশীনাথ মল্লিকের, তালতলার, শ্যামল দাসের বাজার আর বৈঠকখানা বাজার, শোভাবাজার, চাঁদনীচক, বৌবাজার আর টেরিটি বাজার। ১৮১৭ সালে মাছের দর ছিল দেখছি—রুই ২৮ পণে সের, কাতলা ২২, ভেটকী ২০। আটা ত্রিশ সের টাকায়, ভাল ময়দা ১২ সের, উত্তম পাটনাই চাল টাকায় ১১ সের, সবচেয়ে নিরেশ টাকায় ৫৪ সের। ঘি ৩২ ছটাক টাকায়। অবশ্য আজকের দিনের টাকা আর সেদিনের টাকার অনুপাত এক নয়, উৎসাহের আতিশয্যে এই কথাটা আমরা ভুলে যাই।

১৮১৬ সালের ৪ঠা জুলাইয়ের গেজেট খুলে সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়ুন, দেখতে পাবেন, 'হিন্দু কলেজের' প্ল্যান—তার সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ-প্রধানদের মতামত—কি রকম ভাবে পড়ান হবে তার ব্যবস্থা। প্রিপারেটরী ক্লাস ছাড়াও থাকবে একটি সুপিরিয়র বা কলেজ বিভাগ, যেখানে পড়ান হবে ইতিহাস, ভূগোল, ক্রনোলজি, গণিত এবং তুলনা-মূলক দর্শনশাস্ত্র। শুধু বিল্ডিং ফাণ্ডই তোলা হবে না, একটা 'Free Education Fund'ও গড়া হবে। একশো ছাত্র নিয়ে হবে এর পত্তন এবং যে কেউ পাঁচ হাজার টাকা দিলেই এর গভর্নরদের একজন হতে পারবেন। এই হিন্দু কলেজই আমাদের আজকের প্রেসিডেন্সী কলেজের জনক। এ ছাড়াও ছিল আরো অনেক কলেজ, স্কুল, যেমন ধর্মতলা একাডেমী, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি। শ্রীরামপুর কলেজ সম্বন্ধে একটি রিপোর্টে দেখি (১৮২৪ খ্রীঃ স্বঃ ২৭শে মে)—The Committee for conducting the Serampore College frankly acknowledge that its grand and ultimate object is to diffuse the light of divine revelation as

widely as possible...আবার বলছেন—Retain all your religious opinions till you are convinced that they are not worth retaining—অর্থাৎ আমি শুধু মধু খাচ্ছি না—তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণেক তিষ্ঠ—মধু খেয়ে দেখো মধু মিষ্টি কিনা, বিচার করে বুঝে সুঝে বেছে নাও। শ্রীরামপুরের মিশনরীরা নমস্য—তাঁরা জোর করেন নি। কিন্তু অক্সফোর্ডে বোডেন স্কলারশিপ ও অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্নেল জোসেফ বোডেন সমস্ত সম্পত্তি দান করলেন, কারণ—'a more general and critical knowledge of the Sanskrit language will be a means of enabling his countrymen to proceed in the conversion of the natives to the christian religion—টীকা নিষ্প্রয়োজন। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কলেজের এক পারিতোষিক বিতরণী সভায় দেখি আবৃত্তি করছেন রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রেভঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী। কেউ সেজেছেন ব্রুটাস, কেউ সেজেছেন হোরেশিয়ো, কেউ ক্যাসিয়াস্, কেউ ম্যালকম্। আবার ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে দেখি 'নেটিভ ফিমেল এডুকেশন সোসাইটি' স্থাপন হচ্ছে এবং কলকাতার টাউন-হলের এক জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে: That the education of Native females is an object highly desirable and worthy of the best exertions of all who wish well to the happiness and prosperity of India. লাটগিন্নী লেডী অ্যামহার্স্ট তার পৃষ্ঠপোষিকা। কলকাতার বাইরেও দেখি এর প্রভাব। কাশীতে কলেজ স্থাপন করেছেন একজন স্কচ ভদ্রলোক—নাম মিঃ ডান্কান্। কাশী তখন সবে চৈৎ সিংহের দুঃস্বপ্ন থেকে জেগেছে। কাশীর পণ্ডিতরা এক সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংসকে শুধু মানপত্রই দেন নি, 'শ্রীমতনু রাজরাজেষু ইংলেণ্ড ভূমিন্দ্রেষু শ্রীমত কোম্পানৌ চ'। হেস্টিংসের কাছে নিবেদন জানিয়েছিলেন যে তিনি 'নানা-শাস্ত্র কোবিদ' 'নির্লোভ' ও সুশাসন করেছিলেন। আমরা আরো জানতে পারি যে হেস্টিংস বিশ্বনাথ মন্দিরের গলিতে একটি নবতখানা বানিয়ে দেন 'শ্রীশ্রীতোরণ সমীপে.........বাদিত্রং নরেন্দ্র কারয়মাস।

আবার দেখি রাধাকান্ত দেব ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির রিপোর্ট পেশ করছেন। রাজা কালীশংকর ঘোষাল কাশীতে ভরতপুর বিজয়ের সম্মানার্থে ইংরাজদের পার্টি দিচ্ছেন। 'বাবু স্বরূপচন্দ্র মল্লিক জাঁকজমকের সঙ্গে সিংহ-বাহিনীর পুজো করছেন। এই পূজায় খুচরো দেনদারদের জেল থেকে ছেড়ে

দেওয়া হচ্ছে, আপামর জনসাধারণের সঙ্গে তারা পেটপুরে ভোজনই করলে না, নগদ এক টাকা দক্ষিণাও পাচ্ছে, নতুন কাপড় পরছে। ঢাক-ঢোল কাড়া নাকাড়া চৌকিদার চোবদার ব্যাগ পাইপ ব্যাণ্ড সঙ্গে দেবী শোভাযাত্রায় চললেন, সঙ্গে বিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণ। ফিরে এসে দেবী বসলেন সোনার সিংহাসনে, শ্রীকৃষ্ণ রূপোর আসনে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গোঁসাইরা ভোজন করলেন, টাকা পেলেন আর শাল-দোশালা। বিকালে কাঙালী ভোজন হল—দীয়তাং ভুজ্যতাং। সন্ধ্যায় আলোর মালা, নাচের আসর—ভোর পর্যন্ত চলল উৎসবের মহড়া। সমাচার চন্দ্রিকা থেকে উদ্ধৃত বাবু স্বরূপচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে দোলযাত্রার উৎসবেরও এক রঙীন কাহিনী পাওয়া যায়। আবার দেখি বাবু গুরুপ্রসাদ বসুর বাড়িতে মস্ত বড় শামিয়ানা টাঙিয়ে রাত দশটায় আখড়াগানের মহড়া শুরু হল। একদিকে গরানহাটার গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল, আর একদিকে বাগবাজারের মনোহর বসু। গরানহাটী ও মনোহরশাহীর গানের পাল্লার ও কীর্তনের নামডাক অনেক দিনের। প্রথমে আরম্ভ হল দেবী ভবানীকে নিয়ে পালা, তারপরে এলো চুটকি, তৃতীয় পালায় হল প্রভাতী। ভোর ৭টা পর্যন্ত চলল এই হুল্লোড়, কথার ফিরতি আর লড়াই, সুরের জগঝম্প।

দুর্গাপূজার সময় এসব চলত আরো জোরে। বাবুদের বাড়ির নাচের আসরে মায়ের পুজোটা ছিল উপলক্ষ—আসলে চলত সাহেব বিবি গোলামের মিলিত হৈ চৈ নৃত্য-গীত, নারী-সুরা, ঠাণ্ডা মাংস পোলাও। ইংরাজ মুসলমান হিন্দু সবাই আসত।

ঐ সময়কার গেজেটে এক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের তীব্র মন্তব্য পড়ি—As far as we can judge, the Durga Pujah continues to be celebrated with undiminished pageantry and expenditure notwithstanding the diffusion of liberal ideas amongst those especially of the more opulent classes by whom it is observed. It is however a very heterogeneous sort of business, and the performances of Mahomedan singers and dancers, with the appendages of cold beef and beer for the grosser entertainment of European guests are little compatible with the adoration of the Deity. We confess we do not think the sort of association that takes place at the season creditable to any of the parties. এইসব আসরে শ্যাম্পেন ক্লারেটের বিজ্ঞাপনটা খুব জোয়াল

হত। আবার দেখি তালও কাটছে। নাচ দিলেন ১৮৩১ সালে পাথুরিয়াঘাটার মোহিনীমোহন ঠাকুরের ছেলে কানাইলাল ঠাকুর। বাড়ি সাজান হল এলাহী কায়দায়। ভক্সহলের প্রাসাদের অনুকরণে চব্বিশটি থামের উপর সুদৃশ্য প্যাভেলিয়ন তৈয়ারি হল, কিন্তু অভ্যাগতদেরই একজনের বগী গাড়ী চুরি করে চার জন গোরা পালাল। সকালে পাওয়া গেল বগীটাকে ভাঙাচোরা অবস্থায় আর ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা। ১৮২৬ সালের শারদীয়া পূজায় বর্মা দেশ থেকে পোয়ে নাচের আসর এসেছিল গোপীমোহন দেবের বাড়িতে। ১৮১৬ সালের গেজেটে পড়ি (৪ঠা সেপ্টেম্বর) যে এক বৈষ্ণবের এমন এক ছেলে হয়েছে যে পাঁচ দিনেই মায়ের কোল ছেড়ে হামাগুড়ি নয়, সোজা হেঁটে বেড়াচ্ছে। আবার দেখি একজন খ্রীস্টিয়ান চড়কে যোগ দিয়েছে, কান ফুঁড়েছে, কালীঘাটে ঘুরে এসেছে—ঝাঁপ দিয়েছে, সে খবরও ফলাও করে বেরিয়েছে।

এই সময়ে কলকাতায় এক দিকে সদর দেওয়ানী আদালত, অন্য দিকে ইংরেজী কায়দায় সুপ্রীম কোর্ট। সেখানে গ্র্যাণ্ডজুরিরা বিচার করতে বসেন, জজ তাঁদের প্রতি ভাষণ দেন, আইনের বিশ্লেষণ হয়। ১৮২৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে প্রধান বিচারপতি স্যার এডোআর্ড রায়ানের অভিভাষণে দেখি—সেই প্রথম জুরিদের প্যানেলে 'নেটিভ' দের নেওয়া হচ্ছে। এর আগে খ্রীস্টিয়ান ছাড়া গ্র্যাণ্ডজুরিতে বসবার অধিকার ছিল না। অবশ্য তারো প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে ১৭৮৩ সালে হাউস অফ কমন্সের একটি কমিটি বাংলাদেশে জুরিপ্রথা চালান যায় কিনা এবিষয়ে বিচার করেন। স্যার উইলিয়াম জোন্স (এসিয়াটিক্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা) গ্র্যাণ্ডজুরিকে চার্জ দেবার সময় বলেন: There cannot be a nobler tribunal than a jury of experienced men assisted by the learning of a Judge.

গ্র্যাণ্ডজুরি জেল পরিদর্শন পর্যন্ত করতেন। তখনও অভিযোগ হচ্ছে মামলা-মকর্দমায় বড্ড খরচা—expensiveness of law proceedings. এই সময়ের কয়েকটি বিখ্যাত মামলার মধ্যে দুটি জাল দলিল করার অভিযোগ —মহারাজা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যে চার্জ ছিল ও যার জন্য তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। ১৮২৯ সালে দেখি মকর্দমা হচ্ছে The King versus Prasanno Coomar Haldar. এ ধরনের আর একটি মামলা হচ্ছে The King versus Rajah Baide Nath Roy, যাকে জুরিরা বেকসুর খালাস দেন। ১৮২৯

সালে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরও হেরাল্ডের স্বত্বাধিকারী হিসাবে একটি libel caseএ জড়িত।

এ ছাড়া দেখি Salt monopoly নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে, তিতু মিয়া বিদ্রোহ করছেন, হাঙ্গর শিকারের গল্প বেরুচ্ছে, Strand Mills এর বিবরণ, proposed prospectus of a college, ইলোরার গুহামন্দিরগুলির বর্ণনা, ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধানে গবেষণা, আরাকানের কথা, ক্যালকাটা অ্যাপ্রেন্টিস্ সোসাইটির কাহিনী, হর্টিকালচারাল ও এগ্রিকালচারাল সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় দশসেরী ওজনের বাঁধাকপি, ৩।৪ সেরী ফুলকপির ইতিহাস। চল্লিশ টাকা পুরস্কার ও মেডেল দেওয়া হচ্ছে ইউসুফ মালিকে সবচেয়ে ভালো আলুর জন্য। আবার দেখি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে বই বেরুচ্ছে মুগ্ধবোধ, লঘুকৌমুদী, ভট্টিকাব্য, সাহিত্যদর্পণ, রঘুবংশ, লীলাবতীর অঙ্কশাস্ত্র, সংস্কৃতে অস্থিবিদ্যা বা এনাটমি এবং ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চয়নিকা হিসাবে দিগ্‌দর্শন। ১৮২৭ সালে দেখি মেয়েদের উপদেশ হিসাবে 'Matrimonial maxims'ও গভর্ণমেণ্ট গেজেটে স্থান পেয়েছে এবং হাসি পায় পড়ে যখন বলা হচ্ছে—Implicit submission in a man to his wife is ever disgraceful to both, but implicit submission in a wife to the will of her husband is what she promises at the altar ; what the laws of God and men enjoin ; what the good will revere her for, and what is in fact the greatest honour she can receive. হায়রে, 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা' নয়, এ হচ্ছে 'নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' আবার পড়ি যে বেঙ্গল ব্যাংকের নোট ছাড়া মাড়োয়ারী স্রফরা অন্য নোট বা হুণ্ডী ব্যবহার করতে চায় না। বড়বাজারের পগেয়াপটির বাবু মনোহরদাস (যার নামে আজও চক্ রয়েছে) ও গোপালদাস এ বিষয় জল্পনা কল্পনা করছেন। মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের কথা দেড়শো বছর আগেও শুনি। ১৮৩০ সালেই কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত প্রথম ঘোড়ায়-টানা বাস চলে। বাস চলত তিন ঘোড়ায়। তরুণকান্তি ও 'ইয়ং বেঙ্গল'দের আদর্শগুরু ডিরোজিওর বহু কবিতা এ গেজেটে মুদ্রিত হয়েছে। হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষও কবিতা লিখতেন। কলকাতার উন্নতির জন্য লটারি করে টাকা তোলা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিৎপুর রোডে জল দেবার জন্য দশ হাজার টাকা দিলেন এক মুসলমান ভদ্রলোক—আগা কুরবুলী মহম্মদ। স্ট্রাণ্ডরোডকে আগিয়ে নিয়ে

গার্ডেন রিচ পর্যন্ত নিয়ে যাবার পরিকল্পনাতেও এই ভদ্রলোকের সাহায্য আছে। তখন শেয়ার করে টাকা তুলে 'টোল' বসিয়ে রাস্তা তৈয়ারি হত।

১৮২৯ সালে ১৭নং রেগুলেশনে সতীদাহ বন্ধ হল। তার একটা বিশদ-বিবরণ শুধু নয় বাদানুবাদ, ও সেই বিতণ্ডাকে ঘিরে সমাজ মনের এক বিচিত্র প্রকাশকেও দেখি। ১৭৮১ সাল থেকেই এই প্রথা দমন করবার কথা উঠেছে। রামমোহন ও বেন্টিংককেই আমরা জানি সতীদাহপ্রথা বন্ধ করবার উদ্‌যোগী বলে। শোনা যায় ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার স্ত্রী অলকমঞ্জরী দেবীকে জোর করে সতী করান হয়। টাউনহলের সামনে বেন্টিংকের যে প্রতিমূর্তি ছিল তার প্যানেলের নীচে কৃতজ্ঞ কলকাতা সমাজ সতীদাহ নিবারণের একটি রিলিফ চিরকালের জন্য প্রস্তরীভূত করে রেখেছেন। রামমোহন এই বিষয়ে শেষ পর্যন্ত উৎসাহী ছিলেন কিনা এই নিয়ে পণ্ডিত মহলে বাদানুবাদেরও শেষ নেই এবং লর্ড বেন্টিংকের নিজের চিঠিও উদ্ধৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৬ই জানুয়ারি ১৮৩০ সালে লর্ড বেন্টিংককে টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন মনস্বী ব্যক্তি (যার মধ্যে রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুরও ছিলেন) যে মানপত্র দেন সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং এই মানপত্র প্রদান প্রসঙ্গে কলকাতা গভর্নমেণ্ট হাউসে যে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় তাহার সরকারী বিবরণ হচ্ছে এইরূপ: Baboo Rammohan Roy then advanced towards his Lordship and intimated the purpose for which they had come; after which Baboo Collynauth Roy read the Address of the Hindu Inhabitants in Bengallee...... শ্রদ্ধেয় কালীনাথ রায়কে এইজন্য একঘরে হতে হয়েছিল আজকের দিনে একথাও হাস্যকর মনে হয়। ১৮২৮ সালে ১০ই এপ্রিল তারিখের বেঙ্গল হরকরা ও ক্রনিকেলে প্রেরিত ও গেজেটে উদ্ধৃত একটি বিবরণে দেখি যে শালিখা হাওড়ায় একটি সতীদাহ ঘটে। এটি ঘটে প্রকাণ্ড সম্মোহের মধ্যে। মেদিনীপুর থেকে একটি তরুণী সদ্যোবিধবা এলেন 'সতী' হবার জন্য মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে। তার সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক তিন লক্ষ টাকা। পূর্বের দিন তাঁর সমস্ত অলংকার ও নগদ অর্থ সবই দান করেছিলেন আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী গরীব প্রজাদের মধ্যে। ভোর হতেই তিনি সহমৃতা হবার জন্য তৈয়ারি। কত লোক এল তাঁকে বোঝাল, ধর্ম, সমাজ সংসার সবই ডাকলে তাঁকে। তিনি অচল অটল। তিনি পারবেন না তাঁর শপথ ভঙ্গ করতে, তামাতুলসী মাথায় নিয়ে যে

প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি এসে তাকে কত বোঝাল। মহিলাটি যেন ভাবোন্মাদনায় মত্ত—অদ্ভুতভাবে সংযত। অগ্নি সংযোগ হল—ভদ্র মহিলা শান্ত স্তব্ধ হয়ে শবকে আলিঙ্গন করলেন, সবাইকে হাত নেড়ে কিছু করতে নিরস্ত করলেন।

১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর গেজেটে খবর বেরুল এলগিন জাহাজে রামমোহন চলেছেন বিলাতে। সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখেই বোঝা যাবে যে তাঁর সম্বন্ধে সমকালীন কালে ইংরেজদের মধ্যেও কি উচ্চ ধারণা ছিল—The Baboo who is in some degree, a reformer, may be considered as one of those remarkable men who attract attention in their day and generation by outstripping the prejudices and shackles of a peculiar position, and taking nothing for granted examine everything for themselves. রীতিনীতি, আইনকানুন, শাস্ত্রের বিধান-নিদান মেনে না নিয়ে তাকে বিচার করে দেখার এই যে আত্মজ্ঞানসচেতনতা এই ছিল রামমোহন চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর মন ছিল বহতা নদী—সে এনেছিল বহমান মনন ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যের স্রোত। সেকালের সম্পাদক বলছেন: Conscious of high intellectual powers, he determined by a course of self-education to bring them to bear with as much advantage as possible upon society and circumstances around him. রামমোহন শুধু সতীদাহপ্রথা বন্ধের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেন নি, একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যও কঠোর সংগ্রাম করলেন, তুফাৎ-উল-মুহাদ্দীন শুধু বক্তৃতা বা তর্ক নয়—তাঁর আত্মপ্রীতির কথাও। রামমোহন রায়কে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৩১ সালের ৯ই জুলাই যে ডিনার দেন টাইমসে তার খবর ও বর্ণনা বেরোয়—গভর্নমেণ্ট গেজেটে ওর পুনর্মুদ্রণ দেখি ১৮৩১ সালের ১০ই নভেম্বর, এবং সেই মন্তব্যে দেখি—It was rather curious to see the Brahmin surrounded by hearty feeders upon the turtle and venison and champagne touching nothing but rice cold water.

রামমোহন চরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য—অর্জন করব, কিন্তু বর্জন করব না—এই যে গ্রহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা—এটাই তাঁকে ভারতপথ পথিক করেছিল—আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আজকের এই ঝলমলে নিয়ন আর ফ্লোরেসেণ্ট আলোর মাঝখানে মনে পড়ে কি সেই জমাট অন্ধকারের দিনগুলোকে—ইচ্ছে হয় সেই তারাজলা আকাশের এক টুকরো যদি ফিরে পাই—চৌরঙ্গীনাথ তুমি ত ছিলে সাধুসন্ত —অঙ্গহীন হয়ে কোন্ অনঙ্গ দেবতার উপাসনা তুমি করেছ ঐ জঙ্গলে বসে তার হদীস দেখাবে কে—

কূলের উপরে কূলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ
ঢেউয়ের উপরে ঢেউয়ের বসতি ইহা জানে কেউ কেউ।

চৌরঙ্গীনাথ কি জেনেছিলেন যে মত্ত সাগরের ঢেউয়ের উপর বসেই বেঙ্গালায় নেমেছিল পশ্চিম থেকে দুঃসাহসিক বিদেশীর দল। সন্তঃ যৌবনবতী কলকাতাও কিশোরীপূজন কিশোরীভজনে মাতল। তখন ঝঞ্চাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে দিল্লীরাজশালার কক্ষে কক্ষে বাতি নিভছে। বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণির একধারে নিঃশব্দ চরণ ফেলে বণিকলক্ষ্মী এসে দাঁড়ালেন সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে। তাদের নৌকা সোনার তরী হয়ে ফিরে গেল ‘সোনে ভরতি’। বাদাবনের শার্দূল চিহ্নিত পথে পথে বেতের জঙ্গল চিরে গড়ে উঠল গোবিন্দপুর সুতোনুটী। ‘ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী,’ রাত পোহাতেই দেখা গেল বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে সেই সুযোগে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতার কৈশোর, উনবিংশ শতাব্দীতে তার খরযৌবন, বিংশ শতাব্দীতে সে প্রৌঢ়া। নাতিনাতনী, আত্মীয়স্বজন-পরজন, ভুঁইফোড়, আগাছা-পরগাছা, অতিথি-অভ্যাগত, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতের দল নিয়ে বৃদ্ধবয়সে সে হিমসিম খাচ্ছে, টাল সামলাচ্ছে, তাল ঠুকছে—বৃষ্টির জলে ডুবছে, বন্যায় কাতরাচ্ছে—অন্যত্র গৃহ-চ্যুত ভাইবোনদের জন্য চেঁচাচ্ছে। দুমুঠো অন্নের জন্য তার ছেলেরা কাতর, তার মেয়েরা বিপদগ্রস্ত; তার আকাশ হয়েছে ছোট, তার ঘরে পড়েছে বেড়া। তার যৌবনের তপ্ত দিনগুলির কথা স্মরণ করে সে যদি দুটো চোখের জল ফেলে পুজোর দিনে, তাতে যদি তার আত্মানুসন্ধানের দিশা মেলে তবে হয়তো সেটা গ্লানিকর হবে না। একদিন সে ছিল তখনকার রাজপুত্রদের সেরা প্রেয়সী, সাতসাগর, তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে আসত নাইটরা, লর্ডরা, স্যার গ্যালাহডরা—

নিঠুর গরজী তুই মানস মুকুল ভাজবি আগুনে

সে আগুন আজ গেল কোথায়, সে কি দিনান্তের অবজ্ঞার দান হল না আরম্ভেই তার অবসান

নৈঃশব্দে, কর্মের প্রবাহে, বিজ্ঞানীর বীক্ষণে, চাষীর মাঠে, গণচিত্তের উদ্বোধনে প্রেমের রসতীর্থে, সাধকের মহাভাবে কোথায় সে ক্ষেমঙ্কর দক্ষিণপাণি উত্তর সাধক কবি যে আঁকবে কলকাতার এই কান্তদর্শী ছবি। সকল জাগ্রৎ মানুষের কাছে ইতিহাসলক্ষ্মী চোখের জলে এই নিবেদনই জানাচ্ছেন। আজ আমাদের কারুর সঙ্গে বিরোধ নেই বিতণ্ডা নেই বিবাদ নেই—দূর হয়ে যাক সমস্ত সংশয় সন্দেহ সংকীর্ণতা। যেখানে যেটুকু কাজ হচ্ছে—তার সঙ্গেই আমাদের হক আন্তরিক সংযোগ—নবজাগ্রৎ চেতনা বঞ্চনা-বেদনার ইতিহাসের ঊর্ধ্বে উঠে বলুক—

"A deeper dedication to the higher values of life."

—জীবনে মরণে পথের শরণে দুনিয়ার যত পদাতিকদের একটি প্রণাম লহ। কবিগুরুর ভাষায় সেই প্রণামই জানালাম হিং টিং ছট্ মন্ত্র পড়ে। কলকাতা ছাড়বার আগে।

আবছা আলোর অন্ধকারে পথিকহীন পথ বেয়ে মোটর ছুটে চলল সরবে। নতুন পিচ-ঢালা পথ, যার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সম্রাট শের শাহ্, সাসারামে ঐ পথেরই উপর যাঁর সমাধি বিদ্যমান। পূর্ণিমা পেরিয়েছে, কাক-জ্যোৎস্নার প্লাবনে একটা রহস্যঘেরা অপূর্ব অনুভূতি। রাত্রির শেষ প্রহর অদ্ভুত প্রহেলিকাময়। ঠিক ভোরে জাহাজ ছাড়বে আউটরাম ঘাট থেকে। মোটর যখন হাওড়া পুলের উপর পৌঁছল তখনও আকাশে জলজ্বল করছে সুন্দরী শুকতারা, কোন্ শৈলপ্রান্তে এর উদয়, কোন্ দিগ্ভ্রান্তকে এ করবে পথনির্দেশ। পথে যেতে যেতেই কালোর ঘোমটা খুলে অনাগত আলোর আভাস এক অপূর্ব অনির্বচনীয়তায় অপরূপ হয়ে উঠল। একটা প্রসন্ন দিন আকাশের কোণে কোণে উঁকি মারছে, অন্ধকার তরল হয়ে আসছে—পেলাম বুঝি যাত্রাকালীন আশীর্বাদ, আলোর প্রসাদ সেই সদ্যোজাগরিত নীলিমার প্রশান্তিতে। চাকরির চাকায় ঘুরতে ঘুরতে ভারতের দিকে দিকে কক্ষচ্যুত উল্কার মত ছিটকে পড়তে হবে এ কথাটা অবচেতনে জানা ছিল না তা নয়, বরং প্রত্যাশিতই ছিল। তবু যখন উপরওয়ালা দিল্লীশ্বরদের পরওয়ানা এল যে যেতে হবে সাগরপারে তখন দেশের সঙ্গে, সদ্যোবিচ্ছেদের বিয়োগবিধুর ব্যথা যে এত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠবে, ভাবতে পারি নি। এত শুধু বিদায় নয়, এযে বিচ্ছেদ, মর্মচ্ছেদ। গ্রামের প্রতিটি পথ, গৃহের প্রতিটি কোণ, আত্মীয়-স্বজনের সজল চক্ষু সব যেন বলতে থাকে—যেতে নাহি দিব। তবু যেতে হয়, গুরুজনদের প্রণাম করে

মোটরে উঠতে হয়। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে পৌঁছল দোতলা জেটির সামনে। অনতিধৌত স্ট্র্যাণ্ড রোডে তখনও জনতাহীনতার পদচিহ্ন পড়ে।

জেটির দোর গোড়াতেই দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিলেন আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিতরা। রক্তের টানে যাঁরা এসেছিলেন সেই শীতের ভোরে তাঁদের কথা বুঝতে পারি কিন্তু অনাত্মীয় তিন বন্ধু পবিত্র বসু, বিনয় ঘোষ, সরোজ ঘটককে দেখে মনটা সত্যই ভারী হয়ে উঠল। চলার পথে কত পেলাম—তত কি দিতে পেরেছি—ঋণশোধের পালার শেষ-বর্ষণ হবে কবে। জাহাজে ওঠবার পূর্বে নানা কায়দা কসরতের ঠেলা আছে—পুলিশের ছাড়পত্র, ডাক্তারের পরীক্ষা, কাস্টমের পাশ, নানা আইনকানুনের নাগপাশ—টিকে দেওয়া হয়েছে কি-না আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে কিছু আছে কি-না, মালের হেফাজত ইত্যাদি ইত্যাদি। জের মিটতে না মিটতেই জাহাজের অগ্নিগর্ভ গহ্বর বাষ্পরুদ্ধ হৃদয়ে ফোঁস ফোঁস করে 'সিটি' দিয়ে জানান্ দিলে যে ঘাটের বাঁধন ছেঁড়ার সময় হয়েছে, সাধন-সমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে গহন জলধির মত্ত বুক চিরে। শরৎবাবুর শ্রীকান্তের কথা মনে পড়ল—ডেক-যাত্রীদের দিকে দৃষ্টি ঘুরে গেল। সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত মিলেমিশে অথচ নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে মগের মুল্লুকে চলেছে কাবুলীওয়ালা থেকে সুদূর কন্যাকুমারিকার প্রান্তিক দেশবাসী পর্যন্ত—জাতীয় জগঝম্পের সে এক অপূর্ব নমুনা।

আত্মীয় বন্ধুরা ধীরে ধীরে নেমে গেল, খালাসীরা চেন তুলতে লাগল, পাটাতনগুলা গুটান হয়ে গেল, জাহাজ নড়ে উঠল। উদাস নেত্রে চেয়ে থাকি পারের দিকে—ভাবি নতুন কত মানুষ চলতি পথে এসে ভিড়বে, যারা আমাদের চিনবে না, জানবে না। অপরিচয়ের ব্যবধান হয়তো ঘুচবে কিন্তু পরিচয়ের মাধুর্য জমবে না। ছোটখাট ক্ষত ও ক্ষতির মধ্য দিয়ে মনের যে দ্রুত পরিবর্তন হবে কালের সঙ্গে কতটা তার খাপ খাইয়ে নিতে পারব—এই কথাই বারে বারে মনে হয়েছিল। কলকাতা সরে যাচ্ছে একটু একটু করে—আমার কৈশোরের রঙ্গিণী, যৌবনের সঙ্গিনী অতিপরিচিতা প্রিয়বান্ধবী কলকাতা, যার বুকের উপর শুয়ে স্বপ্ন দেখেছি, যার কোলে মানুষ হয়েছি। ছন্নছাড়া জীবনের এক অধ্যায় যদি শেষ হল, আর-এক অধ্যায়ের উদয় হক না কেন আর-এক দেশে। কিন্তু তবু মন শোনে না, সাত পাক নাড়ীর আটপাক বাঁধনে বাঁধা সে। পেরিয়ে গেল প্রিন্সেপ্ ঘাট, খিদিরপুরের ডক, শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন, তিনশো বছরের বুড়ো বনস্পতির ছায়াবহুল শ্যামল আস্তরণ, বজবজের তেলের ডিপো, শাঁকরেলের জুট মিল। চিক্কনদেহা তপ্ত রৌপ্যাঙ্গী ইলিশদুহিতাদের আশ্রয়দাত্রী

উলুবেড়িয়াও অন্তর্হিত হলেন। জাহাজ চলছে সাবধানে পাইলটের নির্দেশে, জলের নিচে অতি-কুটিল বালুচর লুকিয়ে আছে। দূরে দামোদরের মোহানা—বর্ষার ভরা দিনে পাহাড়ের ঢলনামা গৈরিকের ছোপে বছরকার যৌবনস্ফীত সাধ একবার হয়তো মেটে। ক্ষণিকের সে অলীক পরিচয়কে ধরে আঁকড়ে রাখতে সে জানে না। তাই মানুষ আজ তাকে বাঁধবার ভার নিয়েছে—তার বন্য যৌবন শুধু উন্মত্ত কামনায় ধ্বংসই করবে না, নতুন করে শস্যমালিনীকে জায়মান করবে। ছোটনাগপুরের রক্তপলাশের রঙে-রাঙা মহুয়ামাতাল উপলবহুল শৈলবেষ্টিত গিরিকন্দরে এর জন্ম, তারপর হাজারিবাগ মানভূম পেরিয়ে, বর্ধমানের লাল মাটি ছুঁয়ে হুগলী হাওড়ার সমতলে এসে গঙ্গামায়ীর কোলে মুখ লুকিয়েছে এই ক্ষুব্ধ অতৃপ্ত নদ।

বেলা এগিয়ে যেতে লাগল। দূর প্রাচ্যের জাহাজগুলিতে সেই সময় একটা জিনিস থাকত যা অন্যত্র দুর্লভ। জিনিস বললে পাছে অচেতন পদার্থ মনে করেন, সত্যি করেই বলে দেওয়া ভাল যে তিনি একজন জলজ্যান্ত মানুষ, তাকে বলা হত ভাণ্ডারী অর্থাৎ তিনি খাবার সরবরাহকারী। জাহাজের খাবার যদি আপনার অপছন্দ বা মনোমত না হয় বা আপনার যদি ইউরোপীয় খাদ্য সম্বন্ধে প্রেজুডিস্—ছোঁওয়াছুঁয়ির ভয় বা অনিচ্ছা থাকে, এই ভাণ্ডারী আপনাকে গরম গরম ভাত, গব্য ঘৃত, আলুভাতে, মাগুর-কইয়ের ঝোল সরবরাহ করে দিতে পারে, আবার যদি সদ্যোভর্জিত লুচিমাংস চান তাও তার কাছে দুষ্প্রাপ্য ছিল না।

বৈকালিক চা-পর্ব শেষে ডেকে এসে দেখি মাতা ভাগীরথী কলকল্লোলিনী হয়ে ক্রমশই তাঁর উদার আতিথ্যের সীমানার বিস্তার করছেন। দূরে ডায়মণ্ড-হারবার পেরিয়ে গেল—দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির উপর বিলীয়মান দিনান্তের ছায়া, শীতের দিন হলেও ভরা গাঙ, কোথাও একটু চাঞ্চল্য নেই। স্তব্ধ চিকন জলের সন্ধ্যাভ্রের রক্ত রেখা তার শেষ ঐশ্বর্য দান করে জলযবনিকার অন্তরালে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভাঙন-ধরা নদীর কূলে শত শত গর্তে গাঙশালিখের দল ঘুরে ফিরছে। হিজলীর বাঁকে অস্ত-সূর্য ডুবতে লাগল আস্তে আস্তে—মনে হল ঐ বুঝি কাপালিক-পালিতা কপালকুণ্ডলা কানে কানে এসে বলে যাবে—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ।

বাঁয়ে পড়ে রইল কাকদ্বীপ—আসাম ডেসপাচ সার্ভিসের সুন্দরবন পরিক্রমার জলপথ। এখন আর এখানে বাবা দক্ষিণরায়ের সাক্ষাৎ বংশধর বৃহল্লাঙ্গুলাচার্যদের দৈবাৎ দর্শন মেলে। জব চার্নকের অবিবেচনায় ও হঠকারিতায় শার্দুল-

সাম্রাজ্যের সীমানা সঙ্কুচিত হতে হতে আজ ক্ষুদ্রতম গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। একদিন শুনে বাংলার সুতানুটি গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি ত তাদেরই অধিকারভুক্ত ছিল।

কালোর পটভূমে নীলাকাশে ফুটে উঠল দু-একটি অগ্র-উদিত তারা। কালপুরুষ পিনাকপাণি রুদ্ররূপে দাঁড়িয়ে আছেন নভস্থলে, হরধনু আকারে পুনর্বসুর দল। রুদ্র ভয়ঙ্কর দেবতা, তিনি মানুষকে কাঁদান, রোদয়তি মনুষ্যান্। তিনিই পরে শিব, ভব হলেন। হে দেব তোমার দক্ষিণ মুখ দ্বারা আমাদের রক্ষা কর, শতং জীব। জীবিত রাখ, তোমার জ্যা শিথিল কর।

তন্দ্রালসা সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, জাহাজও দুলতে শুরু করে দিল একটু-আধটু। ঘোলাটে জল ক্রমশই কালি-গোলা জলে পরিণত হচ্ছে। বড় ঢেউএর ভাঙা রেশ এসে আছাড় খাচ্ছে জাহাজের ক্ষীণ তনুতটে। জাহাজও যেন তার তালে তালে দেখছে দোলনচাপার স্বপ্ন। সমুদ্রের সূর্যাস্তের বিচিত্র চিত্র অনেকেই এঁকেছেন। আমার শুধু মনে হল যেন মস্ত বড় একটা লাল আবিরভরা আলোর থালা ডুবে গেল কালোর কোলে। বারে বারে সত্যেন দত্তের কবিতার এক টুকরো মনের ভিতর ভিড় জমাতে লাগল :

উগ্র তুমি বাহির হতে ব্যগ্র তুমি অহর্নিশি
অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি
তোমায় কবি বর্ণিবে কে ? নও হে তুমি বর্ণনীয়
আকাশ কথা প্রকাশ তুমি সিন্ধু তুমি বন্দনীয়

চুপ করে বসে রইলাম ডেকচেয়ারে—বেশ কনকনে হাওয়া—রাগ্‌টা টেনে নিয়ে পায়ের উপর চাপা দিলাম। বিশ্বচরাচর সব কিছুই কালোয় ডুবে যাচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিক, ভাঙা চাঁদের মেলা জমতে ঢের দেরি—সেই সীমাহীন অন্ধকারে দিশাহীন সমুদ্রের মাঝখানে কালোর যে অপূর্ব রূপ ফুটে ওঠে তাকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলার শক্তি আমার নেই। তারা-জ্বলা আকাশে মাথা দিয়ে দিগন্ত জুড়ে ক্লান্ত মহাকালী এলোচুলে শুয়ে পড়েছেন দিনান্তের কর্মান্তে। সারা গা বেয়ে সেই অনিন্দ্যকান্তি মেঘবরণীর দ্যুতি চিকচিক করছে। সেই গহিন কালোয় মন যদি ডুব দিত জয় কালি বলে। কিন্তু তা হবার নয়। চপল হাসির এক টুকরো হাওয়ায় ভেসে এসে কিরীটিনী কালোর দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল ছোট্ট আলোকিত সেলুনের দিকে দিকে। জোড়ায় জোড়ায় সাদায় কালোয় নাচের মহড়া চলেছে জোর। মদির পানীয় হাতে কোমল কটির শ্যামল স্বপ্ন ত্রিবলিত সন্ধ্যাকে পর্যস্ত করে তুলছে অবন্ধ্যা। সন্তোমিলনের পরিভূষিত

উৎসবের ছোট্ট ছোট্ট ক্ষণগুলির উপরও এরা জলের দাগে দাবী কেটে জীবনের স্বাক্ষর রেখে যেতে চায়। হয়তো চলে, হয়তো চলে না, কি সাক্ষ্য দেবে লরেন্স বিনিয়ন্, টমাস ইলিয়ট্, এ্যাল্‌ডুস হাক্সলি। একদিন এই বিংশ শতাব্দীতেই ইংলণ্ডে বারট্রাণ্ড রাসেল হয়েছিলেন কারারুদ্ধ, ফ্রান্স রোমা রোলাঁকে করেছিল নির্বাসিত, ভারতে রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন নির্মমভাবে উপহসিত। ফ্রান্স জোরেকে ক্ষমা করে নি, জার্মানী নিকোলাইকে, রাশিয়া গর্কীকে। তবু তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন উন্মুক্ত আকাশের নিচে, বলেছিলেন—'I belong to her.' রোমা রোলাঁ কেঁদে বলেছিলেন ; 'I am expecting an answer from you Hauptmann, an answer that may be an act.'

পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় প্রশ্নের উত্তর মেলে নি।

রসশাস্ত্রবিদ নাগার্জুন বটযক্ষিণীর সাধনায় পাকা বারো বছর কাটিয়েছিলেন। বারো বছর লেগেছিল স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষের মহিমা গত হতে। সে সব যুগ ছিল ছুটির যুগ "দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষমাস।" আজকের দিন হচ্ছে স্পীডের যুগ, শুধু চলার যুগ নয়, চরৈবেতি নয়, দৌড় মারার যুগ, তাই বারো বছর বসে থাকার সময় নেই, নিছক বস্তুতান্ত্রিক বারো মিনিটেই পারদের রসকে ঘনীভূত করে নিতে হবে। সত্যিকার রসিক বলবেন, রস ত সেইখানে যেখানে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কী করি। গেঁয়ো বিশে ভূঁইমালীরাই এসব কথা বলে। On with the dance. এটা ওয়াটার্লুর আগের রাত্রি নয় তবু বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় বীর বিনা আর রমণীরতন আর কারে শোভা পায়রে। সুষ্ঠু ভোগের মধ্যেও যে একটা বলিষ্ঠ জীবনবাদ আছে সেটা কে অস্বীকার করবে। ত্যাগের শুকনো বুলি আওড়ালেই তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ-র রসলোকে যাওয়া যায় না। সবকাম আপ্তকাম হওয়া চাই।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে দিন রাতের তারার সঙ্গে মিতালী চলেছিল, কত কোটি সৌরমণ্ডলের রেণুতে গড়া ঐ আকাশ। সকালবেলা ঘুম যখন ভাঙল তখন পোর্টহোল দিয়ে সোনালী দীপ্তির একফালি কচি ঝলক্ মুখের উপর এসে পড়েছে। সে দিন সমুদ্রে সূর্যোদয় আর দেখা হল না। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে উর্দিসাজ এঁটে চা-পর্ব শেষ করে ডেকে এসে চেয়ার দখল করলাম। সেই ভোরেও একদল ছোট ছেলেমেয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছে। স্টুয়ার্ড এসে বুলেটিন লাগিয়ে দিয়ে গেল কত দ্রাঘিমা লঘিমার মধ্যে আমরা চলেছি, কলকাতা থেকে কত দূরে। দেখতে দেখতে ডেক সরগরম, নানা রকম খেলার শুরু। দড়ির গোল-পাকান রিংগুলো নিয়ে মার্কা-মারা পরিধির মধ্যে ছোঁড়াটাই

বেশ ভাল লাগল। মাঝে বিপদসঙ্কেত ঘণ্টা বাজিয়ে লাইফ বেল্ট পরার ড্রিল হয়ে গেল।

চুপ করে বসে না থেকে ঘুরতে লেগে গেলাম। ছোকরা চাকর বিপিনকে ডাকবার অছিলায় নিচের ডেকে নামলাম। সাড়ে বত্রিশ ভাজার এমন সম্পূর্ণ উপমা আর দেখিনি। অপরাজেয় কথাশিল্পীর ঐ কথাটি একেবারে মরমী সাহিত্যের চরম কথা। গরবিনীদের পরম লগন্। ধরা পড়লাম শেষ পর্যন্ত, পাকড়াও করলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক, বেশ চোস্ত চেহারা, গোস্ত যে খান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং ইংরাজী 'ঘোস্ট'দের সঙ্গে বেশ পরিচয় আছে সেটা মালুম হলো—মশাই, এখানে যে—কী বলতে কী বেফাঁস বলে ফেলি, তাই একটু বোকার মত হাসি। নাহয় আপনি উপরতলার লোক বলুনই না।

বলে কি, ভয়ে ভয়ে জবাব দি—হ্যাঁ, যাচ্ছি এই রেঙ্গুন।

তা চাকরি না ব্যবসা।

মিথ্যে বলে লাভ নেই, সত্যি কথাই বল্লাম একটু বিনয় করে—ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

ভদ্রলোক ফেটে পড়লেন—নিশ্চয়ই বড় চাকরি, ফাষ্টোকেলাসে যাচ্ছেন—

হতভম্ব হয়ে রইলাম—অজান্তে কি অপরাধই করে ফেলেছি। হ্যাঁ, অপরাধ ত বটেই, মহাঐশ্বর্যের নিম্নতলে যে দেশের লোক ক্ষুধানলে জ্বলে—যেখানে social security-র কোনো স্কিম নেই, আরো আরো কত কত কথা—গোলদিঘী মনুমেণ্টের নিচে শোনা পড়া কথা মনে হল, নাঃ ওসব নয় একেবারে from the sublime to the ridiculous—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কমপ্লেক্স।

শুনিয়ে দিলেন তিনি, যে তিনিও বেশ ভালভাবেই এম. এ. পাশ করেছেন, সাহিত্যিক রসবোধ আছে, চাকরির উপর ভীষণ ঘৃণা, স্বাধীনভাবেই জীবিকা নির্বাহ করতে চান। তাঁর বক্তব্য শুনতে শুনতে মনে হল কোথায় যেন একটা বিদ্বেষ ঘনীভূত হয়ে শাণিত ছুরি হয়ে উঠেছে—তার জারকরসের টক্সিনে খাড়া আধ-ঘণ্টা তাঁর অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা শুধু হৃদয়হরণ করলে না, হননও করল। যখনই পশ্চাৎপদ হতে চাই তখনই flank attack—কি মশাই, আপনারা না-হয় উপর-তলার লোক, নিচের দিকে চাইতে বুঝি ভয় বা ঘৃণা হয়, দু'মিনিট কথা কইতে দোষ কি—পয়সা নেই তাই, তা না হলে এই শর্মা, ব্যাটাদের সঙ্গে তাল ঠুকতে ঠুকতে যেত, জানেন আমার ঠাকুর্দা পাতিয়ালার পি. টি. ছিলেন। পি. টি-টা আবার কি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি। প্রাইভেট টিউটর মশাই এটাও বোঝেন না।

জলখেলার সমারোহ। একে বলা যেতে পারে নববর্ষের আবাহন উৎসব বা থিন্ জান্। দেবরাজ ত্যাগামিনের আসন টলেছে—তিনি আসছেন। তিন দিন ধরে আবালবৃদ্ধবনিতা জল ছুড়ে, জলে ভিজে আনন্দের হিল্লোলে ডুব দেয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় আসে 'কাসোন্' উৎসব। লুঙ্গী এঞ্জিপরা নিখুঁত তানাখামাখা ব্রহ্মসুন্দরীর দল ফুলহাতে, দীপহাতে, প্রভু বুদ্ধ লাগি জলের কলস কাঁখে চলেছে ফয়ায় বা প্যাগোডায়,—তরঙ্গায়িত জীবনের সব দুঃখ নিবেদন করে দিয়ে আসবে সেইখানে। তারপর আসে ত্রৈমাসিক ব্রত আষাঢ়ী পূর্ণিমা (ওয়াজো)। ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে এই বর্ষার দিনেই তথাগত নিদেশ দিয়েছেন যে তারা সংযত হয়ে বিনয় ও অভিধর্মের মূল সূত্র অনুসারে জীবন যাপন করবে ধ্যানে, ধারণায়, উপাসনায়।

ত্রৈমাসিক ব্রত শেষ হয় কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়--থাডিন্ জট উৎসবে ব্রতের শেষ উদ্যাপন। বুদ্ধ সন্দর্শনে চলেছেন দেবতারা—তাদের চলার পথ আলোকিত করে দাও—তাই ঐ দিন রাত্রে সারা দেশ আলোর উৎসবে মাতে, রঙীন দীপালিকার মালা পরে। আর-এক উৎসব আছে তার নাম ফুঙ্গীবিয়ান্। যদি কোনো সুপ্রসিদ্ধ ফুঙ্গী মারা যান তাঁর শবদেহে অগ্নি-সংস্কার এক দেহাদ্দেহান্তর প্রাপ্তির নব এক মহোৎসবের সূচনা করে। জাতির উৎসবজীবনে কিন্তু প্রথম স্থান অধিকার করে আছে বিখ্যাত পোয়ে নৃত্য। তার ছন্দ, তার ভঙ্গী, লালিত্য সুষমা সত্যই মনকে এক স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে যায়। শুধু পোয়েই নয় 'ওবি', 'ইয়েন', টৌংবিয়াং, গালাং নাগা, নাট, বৌঙ্গি, জোবাট্, বিলু, জাট্ প্রভৃতি আরো বহু রকমের নৃত্যের প্রচলন এখানে দেখা যায়।

ব্রহ্মদেশের একদিকে মহাচীন আর-এক দিকে মহাভারত। দু দিক থেকে তার উপর কৃষ্টির চাপ পড়েছে বহু। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সমাজ বিন্যাসে, রক্তের সংমিশ্রণে ও ধর্মসংস্থাপনে এই দ্বৈতপ্রভাব সে অতিক্রম করতে পারেনি। নবম-দশম শতাব্দী পর্যন্ত তার ইতিহাসের মোড় কোন্ দিক নিয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা সঠিকভাবে জানা যায় না। কনফিউ-সিয়াসের ধর্ম, লাওৎসের বাণী বা তাওতত্ত্ব তার নানা বিক্ষিপ্ত খণ্ড—জাতিগুলিকে কতটা প্রভাবান্বিত করেছিল তা বলা যায় না, তবে এক ধর্মরাজ্যে বাঁধতে পারে নি। চীনাংশুক বা চীনা শিল্প বা কাগজ তাকে হয়তো অভিভূত করেছিল কিন্তু পরাজিত করতে পারে নি—সে তার

নাটপূজা, পূর্বপুরুষদের পূজা, মন্ত্রতন্ত্র দৈত্যদানব নিয়ে মশগুল ছিল। ভগবান তথাগতের বাণীই তাকে প্রথম প্রবুদ্ধতার পথে এগিয়ে দিলে। কিম্বদন্তী যে, তাপস ও পালিক নামে দুই জন ত্যালাইঙ বণিক ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরিনির্বাণের পরে তাঁর পূত দেহের আটটি কেশ নিয়ে সুবর্ণভূমিতে ফিরে আসেন। তাদের উপর আদেশ হয়েছিল যে তিঙ্গুত্তুর পর্বতের পাদদেশে পূর্ববর্তী তিন জন বুদ্ধের দেহাংশ যেখানে সমাধিস্থ আছে সেইখানেই এই পূত কেশগুলি প্রোথিত করে চৈত্য নির্মাণ করবার। এই চৈত্যই শোয়ে ডাগন্! প্রবীণ 'সুলে' নাট-ই এই স্থান নির্বাচনে সাহায্য করেন। তাঁর নামে রেঙ্গুনের একটি প্যাগোডা বিখ্যাত হয়ে আছে। আর এক কিম্বদন্তী যে শোণ ও উত্তর নামে দুই জন শ্রমণকে সুবর্ণভূমিতে পাঠান দেবানাম প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক। কেউ কেউ বলেন যে বিখ্যাত মহাশ্রমণ বুদ্ধঘোষই এই দেশে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। এই বৌদ্ধবাদ হীনযান না মহাযান না তন্ত্রযান সে কথা সম্যক পরিস্ফুট নয়। যদিও হীনযানী থেরবাদীদের চিত্ত মহাভূমিক বা কুশল মহাভূমিক অভিধর্মই বা বিভাষাই মূল ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে হীনযান মহাযান ও পরে তন্ত্রযান এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ যে প্রত্যেকটি মতেরই প্রভাব এখানে দেখা যায়। এর সঙ্গে মিশেছে প্রাচীন ভূতপ্রেতবৃক্ষ বা 'নাট' পূজা। কেনেথ সণ্ডারস্ নামে একজন লেখক বলেন 'Burmese Buddhists have a vague pantheistic philosophy of life which is more akin to the Mahajana than the Hinajana.'

একাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে থাটোনে বৌদ্ধবাদ বেশ সুপ্রচলিত, সেখানকার রাজার পুস্তকশালায় বহু ধর্মগ্রন্থ, টীকা ও ভাষ্য রক্ষিত হয়েছে —পণ্ডিতরা সম্মান পাইতেছে। তিব্বত ও ভারত হতে 'আরি' নামে এক প্রকার তন্ত্রযানী বৌদ্ধবাদেরও পরিচয় মেলে। একাদশ শতাব্দীতে পাগান রাজ্যের অভ্যুদয়ের সময়েই ব্রহ্মদেশে সদ্ধর্মের সমধিক ব্যাপ্তি দেখা যায়।

রাজা অনোরথই (১০৪৪-১০৭৭ খ্রীঃ অঃ) থাটোন জয় করে ৩২টি হস্তীর পৃষ্ঠে পালি ভাষায় লিখিত শাস্ত্রাদি নিয়ে আসেন। শ্রমণ শিন অর্হন ছিলেন রাজার গুরু ও ধর্মোপদেষ্টা। এই বংশকেই ঐতিহাসিক হার্ভি বলেছেন 'Dynasty of temple builders'। বুদ্ধবাণী নিয়ে কত

আজ বিশ্বকবির সেই বাণীই স্মরণ করব—

ভারতের যে মহিমা।
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গন সীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারা স্রোতে।

সাত ॥

চোখে কি গৈরিক ছোপ লাগল নাকি? ব্রহ্মদেশের মাটিতে পা দিতেই এই বৈশিষ্ট্যটি নজরে পড়ে—হেথায় সেথায় পথে ঘাটে ট্রামে বাসে চলেছে মুণ্ডিতশীর্ষ গেরুয়াধারীরা। এদের ঐ দেশী নাম ফুঙ্গী। কথায় কথায় শুনতে পাই দুটি কথা—ফয়া ফয়া। নিতে এসেছিলেন জাহাজ ঘাটে প্রবীণ রায় বাহাদুর আর নবীন দাসগুপ্ত। শোয়ে ডাগনের দিকে দৃষ্টি তখনও অপাঙ্গে—আকাশে জ্বলজ্বল করছে প্রভু বুদ্ধ লাগি একটি বোধির বর্তিকা, অমেয় প্রেমের আভাস নিয়ে। কার শরণ নিলে কে। মন কিন্তু সাড়া দেয়—শরণ লইলাম, শরণ লইলাম।

জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা ফয়া মানে কি?

হেসে দাশগুপ্ত বল্লেন—ওরা বুদ্ধকে ও তাঁর মন্দিরকে ফয়া বলে—কেমন না?

রায় বাহাদুর—জান না।

আমাদের রায় বাহাদুর হলেন কেমেন্‌-ডাইনের সব ছেলেবুড়ো বর্মীর 'আকোজী'।

একটু হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করি—অর্থ?

পৃথ্বীশচন্দ্র রসিক লোক তায় চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, জবাব দিলেন—অনর্থ কিছু নয়, অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে কাকাবাবু।

রায় বাহাদুর ততক্ষণে আমাদেরই সুখ-সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছেন। বহুদিনের ওপার হতে এই সরস প্রাণচঞ্চল মানুষটির কথা আজও মনে পড়ে মনের মণিকোঠায়।

লোকে বলে, রেঙ্গুণ শহরটা ভারতীয়দের শহর। বাজারে রাস্তায় ঘাটে বাঙালী মাদ্রাজী তামিল তেলেগু মালাবারী কাকার দল জাঁকিয়ে বসেছে এটা ঠিক, তবু পটপরিবর্তনের মত উন্মোচিত হয় দৃশ্যের পর দৃশ্য—জাতীয় জীবনের এক একটি পাতা খুলে যায়। এই ত জাহাজ-ঘাটের পাঁচমিশেলী কলতানের মাঝে বেজে উঠল একটি সুর—মঙতান ইয়ে, লাবা ডিগো যে ডাকছে তার পরনে সবুজ রংএর লুঙ্গি, গায়ে চাঁপাফুলী এঙ্গি, চেরা বাদামের মত কটা কটা চোখ, লালচে ঠোঁট, মাথায় পরিপাটি করে চুলগুলো চুড়ো করে বাঁধা, যাকে ওরা বলে 'সাভো'।

তার নাম কি কে বা জানে। হয়তো বা মা হান্, মা থিন্, মা শোয়ে বা আর-কিছু, সে ডাকছে লাবা ডিগো।

ডিংগীর মুখ কি ঘুরল, সে কি জিজ্ঞাসা করবে ও পারে যেতে ক পয়সা লাগবে, ক তাবিয়া।

ফুঙ্গীদের কথা বলব বলেই গল্পটা আরম্ভ করেছিলাম। তাদের কথা বলেই শেষ করি। শোয়ে ডাগনের নিচে দিয়ে যেতে যেতে কত কথাই মনে হল। ভারতের মহাগৌতম একদিন দেখেছিলেন জরাগ্রস্ত ও জরতীদের, দেখেছিলেন তারা চলেছে দিনে দিনে মৃত্যুর গহ্বরে, দেখেছিলেন আতুর খঞ্জ রুগ্ন তপ্ত আর্তদের, দেখেছিলেন মৃতের শবদেহ, সংসার থেকে পলায়নকারী যতিকে। পিছনে ছুটছে মার, পিছনে ছুটছে তনহা রাক্ষসী।

ভাবলাম—আজও সে যাত্রার শেষ নেই এই বিংশ শতাব্দীতেও—অদ্যাবধি সেই লীলা করছেন গৌতমচন্দ্র। কস্মিং নুখো নিব্বুতে হৃদয়ং নিব্বুতং নাম হোতি—কোন্ আসল জিনিসটিকে জানলে হৃদয়ের সব জ্বালা নিভে যায়।

এই যে ফুঙ্গী-সম্প্রদায়, এদের মধ্যে দুইটি বিভাগ আছে, একদল হচ্চেন novice বা চইন্, যাঁরা সাময়িকভাবে প্রবজ্যা নিয়েছেন আর-এক দল হচ্চেন উপাজিন, যাঁরা চিরকালের মত আশ্রয় নিয়েছেন সঙ্ঘে।

বৌদ্ধ সংঙ্ঘের প্রধান পাঁচটি আদেশ হল :

(১) কোনো জীবন সংহার করতে পারবে না।

(২) কোনো দ্রব্য এঁরা অপহরণ করবে না।

(৩) কোনোরূপ দৈহিক অনাচার এরা করবে না।

(৪) কোনো মিথ্যা বলবে না।

(৫) কোনোরূপ মাদক দ্রব্য ব্যবহার করবে না।

অহিংসা, ব্রহ্মচর্য এইসব সাধারণ নিয়ম ছাড়াও আর পাঁচটি বিশেষ নিয়ম পালন করার উপদেশ দেন ব্রহ্মদেশের শ্রমণসঙ্ঘ।

(১) দুপুরের পর কোনো অন্নভোজন করবে না।

(২) কোনো উচ্চ স্থানে বা গদিওয়ালা নরম কৌচে সোফায় বসবে না।

(৩) কোনো রকম সুগন্ধি, গন্ধ তৈল, ক্রিম, অঙ্গরাগ বা প্রলেপ ব্যবহার করবে না।

(৪) কোনোরূপ নাচগান বা জলসায় তারা যাবে না।

(৫) কোনো মুদ্রা বা অর্থ গ্রহণ করবে না।

এ ছাড়াও আরও কত শত বিধিনিষেধ আছে। সঙ্ঘে প্রবেশ করলে

দু'শো সাতাশটি নিয়ম নাকি মানতে হয়। এই অতি উচ্চাঙ্গের নীতিবাদ বৌদ্ধধর্মের মূল অনুশাসন হলেও ব্যষ্টির জীবনে কতটা কার্যকরী সে বিষয়ে যথেষ্ট বিচারের অবসর আছে।

সে দিন প্যাগোডার নিচে দিয়ে চলেছি, সকালবেলায় স্নিগ্ধ আলোয় অপরূপ হয়ে উঠেছে মন্দিরতোরণ, স্বর্ণাভ চূড়ায় পড়েছে বালারুণ কিরণ। সঙ্গে ছিলেন এক বন্ধু, তিনিই শহর পরিক্রমায় নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ বললেন—জানেন, এরা কিন্তু ভগবান মানে না। আমি বলি—এদের কাছে বুদ্ধই ভগবান, নয় কি? জবাব দেন, হ্যাঁ কারুর কারুর কাছে কিন্তু এরা বুদ্ধের মন্দিরে যায়, প্যাগোডায় ফুল ও বাতি দেয়, প্রভুবুদ্ধ লাগি ভিক্ষা মাগে, শান্ত-সমাহিত মূর্তির কাছে বসে অভিধর্মের সূত্র পাঠও করে, কিন্তু প্রার্থনা করে না। চ মিনকে চেনো ত, কি লিখেছেন জানো: "One never prays to Buddha. There is no equivalent of God in the Burmese language. Only 'Nats' exist, big powerful Nats. Some are guardian spirits, some inhabit mountains, lakes or trees. Some are mighty, some petty, some are benevolent, some are malicious."

ভগবানকে এরা যেমন মানে না, মৃত্যুকে তেমনি বিশ্বাস করে না—এদের কাছে আত্মা অজর অমর—মরণশীল দেহটা শুধু নিঃশব্দে খসে যায়।

বাড়িতে মৃত্যু হলে শোক ত হয়ই না, কোথাও কোথাও প্রায় উৎসবেরই আরম্ভ। 'দেহদ্দেহান্তর প্রাপ্তৌ নব এব মহোৎসবঃ।'

আর-এক দিন আর-এক জন বললেন—জানেন আপনি নতুন এসেছেন এ দেশে, দেখেছেন কি গেজেটে কোনো অফিসার মারা গেলে তার মৃত্যু ঘোষণা করা হয় না, বলা হয় যে তাকে সরকারের চাকরি থেকে অবসর নেবার অনুমতি দেওয়া হল।

সেখানে বসেছিলেন শিক্ষক অমিয়বাবু, হেসে বললেন—আরে, সেবারে আমি তখন বেসিনে, মং চ বলে একটি খ্রীষ্টান ক্যারেন ছোকরা মারা গেল। ভারী সুদর্শন হাসিখুশি ছেলেটি। গেলাম শেষকৃত্যের সময় কিছু ফুল নিয়ে, ছড়িয়ে দিলাম সদ্যঃখনিত মাটির উপর—তার আত্মার শান্তি হক। হরি, হরি হঠাৎ দেখি, তার বন্ধুরা সেখানে একটা নোটিশ লাগাচ্ছে—তাতে লেখা, 'মং চ, তোমার নাম স্কুলের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে, অতএব দয়া করে তুমি আর ফিরো না।'

মৃত্যুর পর অস্তিত্বে-বিশ্বাসী মন এইরকম করেই গড়ে তুলেছে শুধু ভূত প্রেত পিশাচ দৈত্য দানবের দলকে নয়, প্রতি গাছে, প্রতি ঘরে, প্রতি মাঠে, নদীতে নালাতে গিরি উপত্যকায় অধিদেবতাদের, যাদের ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় এক কথায় বলা হয় 'নাট'।

জাতীয় জীবনের নিম্নস্তরে এদের প্রভাব আজও অক্ষুণ্ণ।

আর-এক দিন রৌদ্রস্নাত ঝকঝকে সকালে উঠলাম গিয়ে এক বৌদ্ধ বিহারে। আলাপ হল মঠাধীশের সঙ্গে। ভারী চমৎকার মানুষটি। শান্ত স্থির সৌম্য, পালি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, সামান্য ইংরাজীও জানেন, বললেন—দুঃখ হয়, ভগবান তথাগতের এত বড় আদর্শ সামনে রয়েছে, অথচ, অনিত্য সাধন নিয়েই মানুষ ব্যস্ত—সত্যের সন্ধান কেউ করে না —এইযে সংঘ—এইযে গৈরিকধারী মুণ্ডিত শীর্ষের দল—এর মধ্যে কত জন ব্রতভঙ্গ করেছে, কত জন পালিয়ে এসেছে বিচারের হাত থেকে লুকিয়ে তা কে জানে!

সকালবেলার আলোয় তাঁর মুখমণ্ডল এক অপূর্ব উন্মাদনায় হিরণ্ময় হয়ে উঠল, বললেন—আমার আচার্য আমায় বলতেন, শ্রমণের নিজের বলতে আটটির বেশী জিনিস থাকবে না—তিন প্রস্থ গৈরিক, ভিক্ষাপাত্র, মেখলা কমণ্ডলু, একটি ক্ষুর মস্তক মুণ্ডনের জন্য আর-একটি ছুঁচ কাপড় সেলাইএর জন্য—আর প্রত্যেক উপোসথার দিনে বিনয় পাঠের পর প্রত্যেক শ্রমণকে বলতে হবে (confession) সে কী কী পাপ করেছে আর প্রত্যেক শ্রমণকে পালন করতে হয় চাতুর্মাস্যর ব্রত (Buddhist Lent) বা ওয়া।

একটু হেসে বললেন—চাতুর্মাস্য বলে ঠিক চার মাস নয়—তিন মাস, কোথাও যাওয়া-আসা বন্ধ, ধ্যানে ধারণায় আত্মশুদ্ধিতে পাঠে সময় কাটাতে হয়।

আর-এক দিন আসব বলে প্রণাম করে চলে এলাম। বড় রাস্তায় এসে পড়লাম—চার জন ফুঙ্গী গরম মোয়েঙ্গার ডিশ থেকে নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে। সামনেই প্যাগোডা—পদ্মাসন আছে স্থির, ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন।

॥ তেরো

এক ছিল রাজার মেয়ে, নাম শিন্ শবু।

১৪৫৩ সালের ব্রহ্মদেশ। মহারাজ রাজদরিত, মৃত্যুশয্যায়, যার সম্বন্ধে চরিতকাররা বলেছেন যে শৌর্যে, বীর্যে, উদারতায়, কথায়, কার্যে, তিনি শত্রুদের জয় করেছিলেন, রাজ্যকে সংগঠন করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মেনেছিলেন মৃত্যুর কাছে, মাথা নত হয়েছিল সেইসব শেষের দেবতার কাছে। এত কষ্ট করে গড়ে তুললেন তিনি পিগু রাজ্যটি, এখন কার হাতে দিয়ে যাবেন। বহুপত্নীক রাজার পুত্র-কলত্র বহুই ছিল, তবু পাত্রমিত্র অমাত্যদের ডেকে তিনি বললেন—দেখ, আমার মেয়ে শিন্ শবুকেই এই রাজ্যের অধীশ্বরী বরণ করে নাও। চুপ করে রইল সভাসদ সেনাধ্যক্ষদের দল, মন্ত্রণাপ্রবীণরা। একজন শুধু জবাব দিলে—মহারাজ, আপনার একাধিক পুত্র রয়েছে, তাছাড়া শিন্ শবু অন্য দেশের রাণী, আভার রাজা তার স্বামী—পিগু দেশ ত্যালাইঙ্‌দের পুণ্য দেশ, তার মহান ঐতিহ্য, ভগবান তথাগতের দেশের মানুষদের রক্ত আমাদের ধমনীতে, এই দেশকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া যায়, এ আজ্ঞা করবেন না, মহারাজ—

রাজদরিত অনেকক্ষণ ভাবলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন—আমি ভাবছি আমার দেশের কথা, আমার ছেলেরা সব অপদার্থ, রাজ্যলিপ্সা ভয়ঙ্কর; তারা মারামারি কাটাকাটি করেই মরবে, আর শিন্ শবু রূপবতী গুণবতীই নয়, কোমলে-কঠোরে-মেশান রাজধর্ম সে বোঝে। সে মহদাশ্রয় পেয়েছে, ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘকে জেনেছে—জীবনে মৈত্রীকে মেনেছে। আমি ত জানি তার বিবাহ সুখের হয় নি, যাক আমার দিন শেষ হয়েছে, ফায়ার (ভগবান বুদ্ধের) ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

আভায় বসে শিন্ শবু শুনলেন সব কথা। চোখের জল পড়ল বাপের কথা ভেবে। প্রেমহীন বিয়ের বোঝা তিনি যেন আর টানতে পারেন না। বন্য দুর্দান্ত স্বামী, দিনে দিনে নারীত্বের অপমান, স্বদেশের স্বজাতির জন্য মন কাঁদে। পিতা বেঁচে থাকতেই তিনি লিখেছিলেন তাঁকে—পাঠিয়ে দিন দু জন শ্রমণকে; পাঠ, শীল, পারমার্থিক সম্পদ দিয়েই ভরে তুলব এই জীবনকে। গিয়েছিল দুটি তরুণ শ্রমণ, ভগবান বুদ্ধের নাম নিয়ে। অপূর্ব স্নেহরসে সিক্ত হয়েছিল শিন্ শবুর মন।

দিন যায়, এই দুটি শ্রমণ আর নিজের পেটের মেয়েকে নিয়েই শিন্ শবুর সময় কাটে—শোনেন তাদের কাছে অষ্ট সম্পদার কথা, মহারাজ অনিরুদ্ধের গল্প, শ্রমণ শিন্ অর্হনের পুণ্য কাহিনী। একদিন জিজ্ঞাসা করেন শিন্ শবু—পাগানের আনন্দমন্দির দেখেছ তোমরা—সম্রাট অলংসিথু যেখানে জগদ্ধিতায় বুদ্ধের বাণী উৎকীর্ণ করে রেখেছেন।

পাহাড় পেরিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে নদী পেরিয়ে তার জন্মভূমি—পিগু তাকে ডাকে। একদিন ফিরে চললেন রাণী ঐ দুটি শ্রমণের সঙ্গে। সেই সময় ব্রহ্মদেশে গৈরিকের প্রতাপ অপ্রতিহত। তারা এ রাজ্য থেকে ও রাজ্যে যাতায়াত করত নির্বিবাদে নিঃশঙ্কচিত্তে। শত্রুমিত্র কোনো পক্ষই তাদের যানবাহন আটকাতে সাহস করত না।

ফিরে এলেন বহুদিন পরে পিতৃরাজ্যে রাণী শিন্ শবু। প্রাসাদে রইলেন কিন্তু রাজনীতির চণ্ড ঘূর্ণাবর্ত থেকে দূরে, ভগবান তথাগতের চিন্তায়, মৈত্রী সাধনায়। মনে শান্তি নেই, দেশে অরাজকতা, সদ্ধর্মের প্রচার নেই, গুণীদের বিচার নেই, সবাই স্ব স্ব প্রধান, রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। দ্রুত পটপরিবর্তনের মত রাজার পর রাজা সিংহাসনে উঠছে বসছে মিলিয়ে যাচ্ছে। দেশে অবিচার অত্যাচার অনাচার। সবাই গিয়ে ধরলে শিন্ শবুকে—মহারাণী ভায়েদের অক্ষম হাত থেকে আপনিই তুলে নিন পিতৃরাজ্যভার।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি এই ভার নিলেন এই শর্তে, যে দিনই অন্য কোনো উপযুক্ত অধিকারী পাবেন, সেই দিনই এই ভার তাঁর হাতে দিয়ে তিনি বুদ্ধচিন্তায় মনোনিবেশ করবেন।

এর পূর্বে ব্রহ্মদেশের কোনো মহৎ রাজ্যেই কোনো নারীই রাজদণ্ড তুলে স্বামিনিরপেক্ষ শাসনভার গ্রহণ করেন নি। ঐ দুই শ্রমণ হল তাঁর মন্ত্রী। দেশে এল সুশৃঙ্খলা সমৃদ্ধি অন্ন। প্রজারা জয় গান করে রাণীর। কিন্তু রাণীর মনে সুখ নেই। রাজ্য সাম্রাজ্য অর্থবৈভব মানপ্রতিপত্তি সব মনে হয় এহ বাহ্য। রাতের গভীরে তিনি প্যাগোডার দিকে মুখ করে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন—এ কী হল, . . যেন ডাকছে!

কয়েক বছরের মধ্যেই রাজ্যে ফিরে এল শুধু শৃঙ্খলা নয়, সমৃদ্ধিও। শিন্ শবুও স্থির করলেন যে আর নয়, ছেড়ে দিতে হবে এইসব বাহ্য সম্ভার। কিন্তু কার হাতে দেওয়া যায় দেশের ভার—উপযুক্ত পাত্র চাই। তাঁর কন্যা অবশ্য ততদিনে রূপলাবণ্যযৌবনবতী হয়ে উঠেছে। কিন্তু

সে কী মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজ্যভার নিতে পারবে? অন্ততঃ তার যদি উপযুক্ত স্বামী থাকে তাহলেও বা তাদের হাতে এই রাজ্যভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্তে শ্রাবিকা হয়ে চলে যেতে পারেন। রাণীর চোখে ঘুম নেই, অন্তরে চিন্তার শেষ নেই—একদিকে দেশের কথা, আর-এক দিকে ধর্মের ডাক।

হঠাৎ তাঁর মনে হল এই ত দু জন শ্রমণ রয়েছে—কৈশোর থেকে তাদের দেখেছেন, মাতৃস্নেহে তাদের ঢেকে রেখেছেন, যৌবনে তারা তাঁর সঙ্গে একত্র রাজকার্য চালিয়েছে—কর্মঠ সুস্থ সবল ধর্মপ্রাণ বিচক্ষণ লোক। কিন্তু ভগবান বুদ্ধে নিবেদিত প্রাণ শ্রমণকে তার পথ থেকে তিনি বিচ্যুত করবেন কোন্ সাহসে—অপরাধ হবে না তাঁর। শাস্ত্র লোকাচার রাজবিধি সবই যে তাঁর বিপক্ষে—এযে অনাচার। রাতের অন্ধকারে, দিনে ধ্যানের টুকরোয় রাণী শিন্ শবু প্রার্থনা করেন—বল, প্রভু কি করব, এত বড় অপরাধ তুমি সইবে কি?

শেষকালে তিনি স্থির করেন—এর ভার তিনি ভাগ্যের উপরই ছেড়ে দেবেন। সে দিনও সংঘ-নিয়মানুযায়ী শ্রমণ দু জন এসেছেন রাজবাটিতে তাঁদের প্রাত্যহিক ভিক্ষা গ্রহণ করতে। রাজমন্ত্রী হলে কি হয়, ভিক্ষান্ন ছাড়া তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন না অন্য কিছু। রাণী অন্নের সঙ্গে একটি পাত্রে লুকিয়ে রাখলেন রাজচিহ্নের দ্যোতকস্বরূপ একটি ছোট্ট পাশো (ক্ষৌমবস্ত্র) শ্বেত ছত্র ও তরবার প্রভৃতি। শ্রমণ ধর্মজেদীই ঐ রাজচিহ্ন-লাঞ্ছিত ভিক্ষাপাত্রটি তুলে নিলেন। রাণী মেনে নিলেন অদৃষ্টের ইঙ্গিত—জয় হক ফয়ার, জয় হক ভগবান বুদ্ধের।

তখনই তাঁকে তিনি গ্রহণ করলেন নিজের উত্তরাধিকারী বলে, বিবাহ দিলেন কন্যার সহিত। অন্য শ্রমণ ও আরো অনেকে এই লোকাচার-বিরুদ্ধ কার্যে শুধু প্রতিবাদ করলে না, বিদ্রোহ করলে। রাণী শুধু বিদ্রোহ দমন করলেন না, বললেন—এ হচ্ছে ভগবানেরই আদেশ। আপত্তি উঠল—ধর্মজেদীর যে রাজরক্ত নেই। রাণী শুনে হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা; নদীর উপরে যে কাঠের পুল রয়েছে তার একটা টুকরো নিয়ে এস ত। কাষ্ঠখণ্ডটি আনা হলে তিনি আদেশ দিলেন যে এই থেকে একটি বুদ্ধমূর্তি তৈয়ারি করা হক। তারপর তিনি নিজে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে প্রণাম করলেন, বললেন—এই ত কাঠের খণ্ড, একে তোমরা কাল মাড়িয়েছিলে, আজ পূজা করছ, প্রণাম করছ।

আর-এক দিন রাণী চলেছেন শহরের মধ্যে শিবিকায় চড়ে—মাথায় মুকুট, হাতে তরবার—ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধকে সরিয়ে দেওয়া হল। সে বললে—আমি বৃদ্ধ বলে আমাকে সরিয়ে দিলে কিন্তু যার জন্য আমাকে সরিয়ে দিলে সে যে আরো বৃদ্ধা।

রাণী চমকে উঠলেন—না, ভগবান ডাকছেন, ফায়া ডাকছে।

রাজ্য ছেড়ে এবারে চললেন শিন্ শবু, শোয়ে ডাগনে—রেঙ্গুনের বিখ্যাত প্যাগোডা, যেখানে তথাগতের মাথার চুল প্রোথিত আছে, ভারত থেকে যাকে এনেছিলেন তাপস ও পালিক্ নামে দুই সওদাগর। ভগবান নাকি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সুবর্ণভূমিতে ত্রিগুত্তর পর্বতে এই স্মৃতিচিহ্নকে রক্ষা করতে। কোথায় এই পুণ্য পর্বত খুঁজেই পান না এই দু জন ভক্ত। শেষ পর্যন্ত প্রবীণ 'সুলে' নাট (বিদেহী আত্মা) তাঁদের স্থান নির্দেশ করে দেয়। অশোকপ্রেরিত শোন ও উত্তরও নাকি এইখানে সাধনা করেন।

রাণী এইখানেই আশ্রয় নিলেন, শেষ জীবন কাটাবেন প্রভু বুদ্ধ লাগি। ঐ ত তিনি বসে আছেন রাজাধিরাজ নির্বৈর নির্ভয় নিরহঙ্কার শান্ত নিরঞ্জন—ভূমিস্পর্শ মুদ্রায়। পদ্মাসন আছে স্থির ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন, চিরদিন, মৌন যার শান্তি অন্তহারা, বাণী যার সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

পাঁচ শো যুদ্ধবন্দী এল—নতুন করে গড়ে তুলতে লাগল প্যাগোডা-গুলি—চুয়াল্লিশ জন লোক নিযুক্ত করা হল, যারা শুধু দীপ জ্বালবে। নিজের হাত নিজের কেশ দিয়ে তিনি মন্দিরের দুয়ার পুঁছতেন—নিজের হাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলে ধরতেন তাঁর সামনে—জ্ঞানের আলোক ঠিকরে পড়ুক।

৭৮ বৎসর বয়সে যে দিন তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন এল, সে দিন তিনি অনুচরদের ডেকে বললেন—আজ আর আমাকে ঘরের ভেতর রেখ না—আমায় বাইরে আকাশের নিচে শুইয়ে দাও—মহাশূন্যের নিচে।

দূরে ত্রিশরণের মন্ত্র উচ্চারণ করছে শ্রাবক শ্রাবিকারা, ভেসে আসছে বিনয়ের ছন্দ, অভিধর্মের অনুশাসন—দুঃখ, অনিত্য ও অনর্থ—শরণ লও—শরণ লও।

॥ চৌদ্দ

সে দিন ইতিহাস উল্টে যাওয়ার দিন। রাষ্ট্রব্যবস্থা পড়েছে ভেঙে, সমাজ-চেতনা হয়েছে ক্ষীণ, রাজা নেই, রাজকর্মচারী নেই, অন্ন নেই, আশ্রয় নেই, অরাজকতার বিভীষিকা, আইন পুলিশ ত দূরের কথা। দুর্দণ্ড চণ্ডবেগে প্রচণ্ড দর্পে এগিয়ে আসছে শত্রুর দল। স্বামী ছেড়ে গেছে স্ত্রীকে ফেলে, ভাই দেয় না ভাইকে আশ্রয়, রাস্তায় মায়েরা কাঁদে, শিশুরা ভেসে বেড়ায়। হাস-পাতালে রোগীকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে ডাক্তার নার্সের দল। বন্দীরা জেল ভেঙে বেরিয়েছে। উন্মাদেরা দিশাহারা, ঘুরছে রাস্তায় রাস্তায়। আছে কুকুর-শিয়াল-শিবা-শকুনেরা আর নরমাংসলোভী নারীমাংসগৃধ্নু শ্বাপদ মনুষ্যের দল তাদের করাল দংষ্ট্রা ব্যাদন করে। অত্যাচার অনাচার অবিচারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎঝঞ্ঝাঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে বজ্রশাসনে মৃত্যুবাহন 'ফোর হর্সমেন্ অফ দি অ্যাপোক্যালিপ্স' (Four Horsemen of the Apoca-lypse).

১৯৪২ সালের মার্চ মাস, ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন শহর। মেদিনী করেছেন রথচক্র গ্রাস। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের অক্ষ বেয়ে মদায়ত্ত পৌরুষের ছেঁড়া স্বপ্ন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ভবনে ভবনে রব উঠেছে—পালাও পালাও। দুর্গম গিরিকান্তার মরু পার হয়ে—চল্ রে চল্। বীরের বেশে কদম্ কদম্ পা বাড়িয়ে নয়, কেঁদে ককিয়ে জীবনে হতাশ্বাস হয়ে অর্থসামর্থ্য হারিয়ে। এ ত পক্ষীরাজ ঘোড়ায়-চেপে-আসা তলোয়ার-হাতে রাজার ছেলের রঙীন রূপকথা নয়, সওদাগর পুত্রের মনবন-বিহারিণী কমলে কামিনীও এখানে নেই, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীদের প্রেমের গল্প ফাঁদতেও বসি নি।

শহরের বাহিরে কোকাইন্ লেকের শান্ত জলের ধারে আমার বাসা। আকাশে বিদ্যুৎগর্জনের মত উড়ো জাহাজের গতিবিধি ও নিকটবর্তী বড় রাস্তায় মিংলাডন্ বিমানঘাঁটিতে যাতায়াতরত লরীর শব্দ ছাড়া সেই ভূখণ্ডে, একটা অখণ্ড শান্তির পরিবেশ ছিল। শুধু যখন 'এয়াররেড' হত তখন মাটির অভ্যন্তরে গুহান্বিত গহ্বরেষ্ঠ হয়ে ব্যোমবিহারী রণদেবতাদের হুঙ্কার শুনে জীবনের নিত্যতার ঐকান্তিক মর্মান্তিক বৈদান্তিক রূপ দেখতাম আর বিদেশ বিভুঁয়ে পৈতৃক বাঙালী প্রাণটি এই বুঝি খাঁচাছাড়া হয় তারই বিভোর স্বপ্নে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম।

আকাশে তখনো ভরা ভোরের প্রসন্নতার আমেজ লেগে। গলায় গান এসে গেল—অন্ধজনে দেহ আলো। সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যদেব তাঁর অরুণ রথে রাজ্য ভাঙা-গড়া তুচ্ছ করে জীবনমৃত্যুর ওঠা-পড়া তুচ্ছ করে তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক পরিক্রমায় বেরিয়েছেন।

অন্তরে যা ডুবে আছে আলোকপানে তুলে দে।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসেছি আমি ও আমার বন্ধু সন্তোষ দাশ। হাওয়াই আফিসের বড় পাণ্ডাদের একজন। যুদ্ধের সময় এইসব আবহাওয়াবিৎ বিলেত-ফেরত বিশেষজ্ঞদের কদর বেশি। চীনা সমুদ্রে টাইফুন উঠলে উড়ো জাহাজ কি রকম ধাক্কা খাবে, বারি ঝরবে ঝরঝর কোথায়, তার অলিখিত গণনা অঙ্ক কষে পার করবে কে, সুন্দরী ধরিত্রীর আণবিক যৌবন হৃদয়ের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে কোথায় দোলা দেবে তাকে, দু বাহু বাড়ায়ে সিস্‌মোগ্রাফে ধরবার তোড়জোড় করবে কারা। হঠাৎ একটা জীপ এসে থামল—বেরিয়ে এল আমারি সহকারী একটি ইঙ্গ-ব্রহ্ম তরুণ, বললে—সার, এইমাত্র রেঙ্গুন এভাকুয়েশনের হুকুম হয়েছে, সমস্ত অসামরিক লোককে চলে যাবারি নিদেশ দেওয়া হয়েছে। মাথায় বজ্রাঘাত হল, যদিও অবস্থাটি আয়ত্তের বাইরে যাচ্ছে জানা ছিল। হয়তো অবচেতনে আশা ছিল যে যদি হোমরাচোমরাদের ধরে বিশুদ্ধ তৈলাদিমর্দনে সুযোগ সুবিধে পাওয়া যায় শেষ মুহূর্তে প্লেনে বা জাহাজে পালিয়ে যাবার। দাশ সাহেব কিন্তু নির্বিকার, বললেন—অত ঘাবড়াচ্ছ কেন বন্ধু, যেতে ত হবেই, ব্যবস্থা করছি সব। আজ রাত্রিশেষেই দেব লম্বা—এখন নয়, রাস্তায় পিপঁড়ের মত লোক চলেছে, এগুতেই পারব না। তাছাড়া দুখানা গাড়ি রয়েছে, পেট্রোল রয়েছে, কিছু আয়রন রেশন অর্থাৎ শুকনো মেওয়া, বিস্কুট মাখন ইত্যাদি তারপর—

আমি যোগ করে দিলাম—তারপর—

ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে
মরণং গোমতীতীরে অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।

একটা দিক দিয়ে আমরা কিন্তু ঝাড়া হাত-পা নিশ্চিন্ত—সুবিধে এই যে কণ্ঠলগ্নারা কেউ নেই। সংলোবে .নর ছেড়ে সতীরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে পূর্বেই পগার পার হয়েছেন। কানে কানে বলবার সময়ও হয় নি—সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ। বেশ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণেক তিষ্ঠ যাবৎ মধু পিবাম্যহম্ বন্দরের কাল কিন্তু পূর্ণ—মহাকাল ভয়াল বেশে আসছেন—এখন শুধু অন্ধাত্রাতে নৌকা ভাসানো।

মৃত্যু যেদিন বলবে জাগো, প্রভাত হল তোমার রাতি
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।

হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লক্ষ লক্ষ লোক স্ত্রী পুরুষ শিশু, অন্ধ বৃদ্ধ খঞ্জ ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে, শুধু জাহাজে প্লেনে নয়—দশ টাকার টিকিট হাজার টাকা মুনাফা দিয়ে কিনে যারা পালাতে পারে তারা নয়—আরাকান ইয়োমার দুর্গম পথ দিয়ে, আকিয়াবের কূলেকূলে ফুটো নৌকো সাম্পানে চড়ে ইরাবতী পেরিয়ে চিণ্ডউইন পার হয়ে, টামু প্যালেল মণিপুরের অরণ্যবন্দন মর্মর পথ বেয়ে—ভামো মিচিনাকৈ পিছনে ফেলে নাগা পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিরে আসামের বনে জঙ্গলে চলেছে কারা উত্তরাস্য হয়ে কোন্ শরণার্থী আশ্রয়-প্রার্থী।

মনে পড়ছে যে দিন প্রথম ব্রহ্মদেশে আসি। রেঙ্গুন নদী বেয়ে আসতে আসতে চোখে পড়েছিল অধঃমূল ঊর্ধ্বশাখ দেবতাত্মা একটি মন্দিরের স্বর্ণাভ চূড়া, পড়ন্ত রোদের অরুণ কিরণে হিরণ্ময়।

রেঙ্গুনের স্মৃতি পিছনে পড়ে থাক—নাই নাই সময় নাই, সময়ের হৃদয় হরণ করেছে পিছনে-ধাওয়া-করা সৈন্যের দল। অতএব চল্ রে চল্। ভোর-রাতের সুন্দরী শুকতারা তখনো জ্বলছে। বিদায় বিদায়! রেঙ্গুন বিদায়! শোয়ে ডাগন প্রণাম—

পদ্মাসন আছে স্থির ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন চিরদিন
মৌন যার শান্তি অন্তহারা, বাণী যার সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

শম্বুক গতিতে চলেছি আমরা—পথে অগণিত জনতা, নানা ধরনের যান—সব ধরনের মানুষ—পদযাত্রা ত আছেই, সবাই একটি চেতনায় উদ্বুদ্ধ—পালাও, পালাও। পেগু ও প্রোম রোডের জংশনে এসে খবর পাওয়া গেল যে পেগু রোডে জাপানী স্নাইপারদের অগ্রগামী দলকে তৎপর হতে দেখা গেছে। অতএব সেই বিরাট জনতা সে পথ ছেড়ে কিঞ্চিৎ বামে ঘুরল প্রোমের দিকে। এ পথ গেছে কোন্খানে গো কোন্খানে—কোন্ পাহাড়ের পারে কোন্ সাগরের ধারে কোন্ দুরাশার দিক পানে। তবু নিয়মমত সন্ধ্যা নামে—আকাশ কাল হয়ে আসে যেমন নেমেছিল তার আগের দিন যেমন আসবে অবগুণ্ঠিত হয়ে তার পরের সন্ধ্যায়। মহাপ্রকৃতির নিয়মে কোথাও এক-চুলও যতিভঙ্গ নেই—মহাকালের নৃত্যে তালভঙ্গও হয় না। প্রোম্ শহরে পৌঁছে গেলুম সন্ধ্যার কিছু পরেই—কৃষ্ণায়িত শহর—কালর বোরখা-পরা রাত। আশ্রয়হীন আমরা, ঘুরছি—স্টেশন থেকে ডাকবাংলো, ডাকবাংলো থেকে

বাজার—স্থান নাই স্থান নাই ছোট্ট এ তরী। সবই আগন্তুক 'রেফুজী'তে ভর্তি। এসেছি ত মোটে একশো তিরিশ মাইল—তবুত আমরা সৌভাগ্যবান—চারিচক্রযানে এসে পৌঁচেছি—বাকী পথের আরো পাঁচ শো মাইল অন্ততঃ এই ভাবেই যাওয়া যাবে—মাগুয়ালে মেমিয়ো পর্যন্ত। তারপর বাকী দেড় হাজার মাইল ওঁ নমো নারায়ণায় বলেই পাড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় কী?

এমন সময় মনে পড়ল—ঠিক যেন অকূল সমুদ্রে দিশাহারা নাবিকের 'লাইট্ হাউস' দেখার মত যে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পুণ্যানন্দ (এখন রহড়ার অধ্যক্ষ) এখানেই শহরের সংলগ্ন কোনো স্থানে একটি সেবাশিবির খুলেছেন। গত দু মাস ধরেই আরাকান আকিয়াবের পথে পাহাড় সমুদ্র পেরিয়ে বহু ভারতীয় ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করতে চেষ্টা করেছেন। সর্বস্বান্ত হয়ে, ক্ষত বিক্ষত হয়ে, রোগে শোকে, কেউ স্বামী, কেউ পুত্র, কেউ স্ত্রী হারিয়ে বহু লোক এ পথ দিয়ে পার হয়েছিলেন। রোগ, মারী, পথের কষ্ট, জলাভাব, আর্থিক অসচ্ছলতা, চোরডাকাতের ভয় কিছুই আটকাতে পারে নি এই ভীত ত্রস্ত মানব যূথদের। ইরাবতীর ও পারে শুনলাম কলেরায় ছারখার হয়ে গেছে কয়েকটি ভারতীয় বসতি। নেই সেবা পথ্য ওষুধ, নেই ডাক্তার নার্স অর্থ, নেই মাস্ ইন্‌অকুলেশনের ব্যবস্থা।

যাই হক নিষ্প্রদীপ শহরে খুঁজে পেতে ধুঁকতে ধুঁকতে রাত দশটা নাগাদ প্রোমের শহরতলিতে স্বামী পুণ্যানন্দের আস্তানা খুঁজে পাওয়া গেল। বেরিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে নিবেদিত সৌম্য সহাস বিকচ নয়ান দুটি মানুষ—স্বামী পুণ্যানন্দ ও তাঁরই সেদিনকার সহকারী রঙ্গনাথানন্দজী (এখন রামকৃষ্ণ মিশন্ ইন্‌টিটিউট অফ কালচারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ)। অত্যন্ত সহজভাবেই আমাদের গ্রহণ করলেন, যেন আমাদের আসার সবই স্থির ছিল—অত্যন্ত প্রিয় অভ্যাগত অতিথি আজও কানে বাজছে—আসুন, আসুন। অসহায় মানুষের কাছে সে কী পরম আশ্বাসময় অভ্যর্থনা। সে রাত্রির সাধারণ হৃদ্যতা অসাধারণ হয়েই আমার মনে বেজেছিল। সেই বলিষ্ঠ আশ্বাস হৃদয়কে ভরে দিয়েছিল—স্মৃতির অক্ষরে সোনার স্বাক্ষরে মনের মণিকোঠায় সে গাঁথা হয়ে আছে।

সব খবর শোনবার আগেই পুণ্যানন্দজী বললেন—এখন কথা থাক, আগে গরমজলের বন্দোবস্ত করি, কারণ এখানে ভীষণ কলেরা হচ্ছে আর আপনাদের ত টিকা নেবার সময় হয় নি। নিজের হাতে কাঠ জেলে জল গরম করলেন আমাদের জন্য, সামান্য কিছু আহারেরও ব্যবস্থা হল সেই গভীর রাত্রে—তারপর পাশাপাশি শুয়ে পড়া গেল কম্বল মুড়ি দিয়ে—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের

কথা ভাবতে ভাবতে। পুণ্যানন্দজী আমাকে বললেন—আপনার শরীর দেখছি সুস্থ নয়—আমার এখানে বিশ্রাম করুন—আমার অবশ্য ভারতে ফিরে যেতে দেরী আছে—তারপর কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—না, কলেরার রাজ্যে আপনাদের থাকতে বলতে পারি না—মান্দালয়ে যান সেখানে যদি ভাল ব্যবস্থা কিছু করতে পারেন আমি আছি—সঙ্গে নেবো, কিছু ভাবনা নেই।

রঙ্গনাথানন্দজীও আমাকে বললেন—আমি আরাকান পথে শীঘ্রই বেরুচ্ছি—আপনি চলুন আমার সঙ্গে—আমি আপনার ভার নেবো।

স্বামী পুণ্যানন্দের সঙ্গে তারপর কত কথা হল—অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে তিনি বললেন—দাবানলের মত জ্বলচে কলেরার আগুন—কিছুই করতে পারছি না, না আছে ওষুধ না আছে পথ্য। মনে হল সেই বরিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ কর্মকুশলী ত্যাগীর চোখে যেন দু ফোঁটা জল দেখলাম। ভাবলাম—আমিও ত ভদ্র শিক্ষিত যুবক, প্রগতির কথা বলি, সভায় সমিতিতে শিক্ষাদীক্ষার, কালচার কুলচুরের বড়াই করি, কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীব-শিবের-সেবার কী মন্ত্র এঁদের চেতনায়, মননে ধ্যানে নিদিধ্যাসনে কানে দিয়ে গেছেন যে এঁরা স্ত্রী পুত্র সংসার করলে না, বৃথা অর্থ আভিজাত্য মান সম্মানের তোয়াক্কা রাখলে না, 'ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নিল' হলেও কাজের কমতি হল না।

আমার ভাণ্ডার আছে তোমা সবাকার ঘরে ঘরে আর পেলে, যে পাওয়া সবচেয়ে বড় পাওয়া, শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসা শুধু নয়—নরের মধ্যে নারায়ণকে।

যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

শেষ রাত্রে ঘুমটা একটু মৌজ করেই এসেছিল আমিরী মেজাজে। উঠে দেখি স্বামী পুণ্যানন্দজী লেগে গেছেন আমাদেরই তদ্বিরে। মাটির উঠানের একদিকে লম্বা করে কাটা উনুন—কাঠ জ্বলছে—একদিকে গরমজল, আর-এক দিকে গরম খিচুড়ী—সাতটায় আমরা বেরুব—দু শো মাইল পাক্কা পাড়ি দিতে হবে—পার্বত্য বন্ধুর পথ কিছুটা।

গরম জলে স্নান করিয়ে উষ্ণ অন্নব্যঞ্জনে উদরদেবতাকে পরিতৃপ্ত করিয়ে আশ্বাস দিয়ে ভরসা দিয়ে সে দিন আমাদের বেলা সাতটায় সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান থেকে যিনি আমাদের সহাস্যবিদায় দিলেন তিনিই পুণ্যশ্লোক পুণ্যানন্দ—সূর্য সবে আকাশপটে মাথা তুলেছেন—তারি এক ঝলক্ আলোক মুখে পড়ল তাঁর—সামনে এক অজানা পথ ডাকছে—

পথের সাথী, নমি বারংবার
পথিক জনের লহ নমস্কার।

॥ পনেরো

আসামের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের নবোঢ় পর্বটির কথা আজও জ্বলজ্বল করছে মনে। যেতে হয়েছিল সরকারী কাজে উত্তর-পূর্ব আসামে, আজকের দিনের নেফা, মণিপুর ও সদিয়ার কাছাকাছি। ফিরছি সেখান থেকে মেঘ-মেদুর সজল দিনে। গৌহাটিতে পৌঁছতেই হল সন্ধ্যা। যুদ্ধের বাজার—আমেরিকান ও ইংরাজ অফিসার ছিলেন সঙ্গে, বললেন—কুছ পরোয়া নেই, মিলিটারী ট্রাকেই স্পেশ্যাল গেস্টের ছাড়পত্র নিয়ে যাব শিলংএ। মা ভৈ বাণীর ভরসা পেয়ে বরষামঙ্গলের দিনে ভরসামঙ্গল গাইলাম। শিলংএর সঙ্গে রাতের কাল অন্ধকারের অবগুণ্ঠনের মধ্যেই হল দেখা—বলা হল না—অবগুণ্ঠনখানি খোল। পাইন উড হোটেলে পরের দিন যখন ভোর হল, সে এক অপরূপ দৃশ্য! কনকবরণীর কনকাঞ্চলে যেন কোমল হীরের দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে। পাইন বনের ধারে ধারে তখনও লেগে রয়েছে বর্ষণক্লান্ত রাতের ক্লান্তি। মনে পড়ল শতপথব্রাহ্মণের কথা। ঋষি বলেছেন পূর্বাস্য হয়ে—সরস্বতীর তীর হতে আহিতাগ্নি নিয়ে বেদবরদমন্ত্র কণ্ঠে অনবগুণ্ঠিত উষার উদয়পথে—প্রাগ্‌জ্যোতিষ তাই ত নাম। শুধু ত আর্যদেরই প্রবেশ ঘটে নি কামরূপে। তারো আগে এসেছে আগন্তুকের দল কিরাত, নিগ্রো, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া বনে অরণ্যে শ্যামল গিরিকন্দরে। তাদের আজও দেখেছি ঝুম চাষের ফাঁকে ফাঁক আ-মা-তি উৎসবে, নমক্রিম নাচের আশে পাশে, সৌরমপীঠে, রত্নপীঠে, কা-মা-ই-খায়, কৃষিপ্রধান গ্রামীন সভ্যতায়। মহাচীনের প্রান্তর থেকে নেমেছে কেউ কেউ, মগধ গৌড় মিথিলা অঙ্গবঙ্গ কনৌজ থেকে এসেছে অনেকে—কর্নাট কেরলের কাব্যকুহেলিতে। আবার এসেছে শিমশ্যাম ব্রহ্ম থাইমন্‌ দেশের লোক যাদের আমরা বলেছি অহম্‌, অচম্‌, অসম—কেউ বশিষ্ঠের উপাসক, ইন্দ্রের সন্তান, স্বর্গদেবতার বংশধর। কেউ নিয়েছে তথাগতের নাম, ধরেছে নাথদের পন্থা, কেউ-বা অঘোরপন্থী শাক্ত, কেউ-বা নামঘোষার বৈষ্ণব। এই বিচিত্র মোসেইকে গড়া আসামের বভ্রুবাহনের দল, তার শশিশেখর প্রিয় পিনাকিনের ভক্তেরা, তার বাণ উষা, অনিরুদ্ধ ভগদত্ত, উলুপী, ঘোটক, ঘটোৎকচ, হিড়িম্বা। এখানেই দেখেছি (কারো কারোর মতে) বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, শক্তি আলিঙ্গিত হেবজ্র, হাটকেশ্বরের মন্দির, বশিষ্ঠবাদ, কপালমালা পরিশোভিত, মন্দার মালা

পরিশোভিত অর্ধনারীশ্বর যাঁর একদিকে উদ্যতফণা, আর-এক দিকে লীলাপদ্ম। মন্ত্র, ভনিতা প্রকরণ, শূন্যপুরাণ, চর্যাপদ, বিহুনাম, আইনাম, খনার বচন, ডাহুকের ডাক, পঞ্চ গৌড়েশ্বরের সভায় কবিরাজ কন্দলীর কাব্য সবই মিশেছে কামরূপের ইতিহাসে। বরশীবোয়ার পাষাণগাত্রে খোদিত লিপিতে তুর্কীদের হাতে লাঞ্ছিত জনগণ আজ তাদের মধ্যে আত্মগোপন করেছে, গেল কোথায় কুললুপ্ত কলিতারা, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধরা, চিলাবায়, মীরজুমলা, রাম সিং লাচিত বড়ফুকন্। দেখি আসছেন আগমবাগীশ তন্ত্র হাতে মন্ত্র দিতে রাণী মদম্বিকাকে, রুদ্রসিংহকে, শিবসিংহকে। এরও পরে এল বর্মীরা, ইংরাজরা। ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে আর-এক দল গড়ে উঠল করণিক কুল, উকীল ডাক্তার শিক্ষক—তারও পরে এই সে দিন শবনার্থী সর্বহারার দল। হাজার বছর ধরে আলৌহিত্য হিমাচলে রক্তে রক্তে বন্ধন লেগেছে, ভাষায় ভাষায় গিট বেঁধেছে, মানুষে মানুষে মিলিয়ে মহাদেবতার সৃষ্টি হয়েছে। সে ত কোনো বন্ধনছেদন সংশয়ভেদন 'খেদা' মন্ত্রে মিলিয়ে যাবে না —এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে সবার পরশে পুণ্য-করা পবিত্র তীর্থের একটি অংশেরই নাম আসাম। যাঁরা অহম জাতিভুক্ত তাঁরাও আগন্তুক। অচম-অচম—অহম তারা peerlassই হন বা স্বর্গদেবতার সন্তানই হন তারা 'ব্রহম'দের স্বগোত্র—তাই তাঁদের নাম a foreigner's name. উত্তর প্রান্তে এখনও শোনা যায় বর্গীর গানের মত—অহম আইছে অহম আইছে শুই থাক্। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ শুধু একটা ভৌগোলিক সীমায় নিবদ্ধ নয়, তার একটা আদর্শের ঐতিহ্যের সংস্কৃতির রূপরেখা আছে। সেখানে সে দেবে তার তপতপস্যা, তার জ্ঞানবিজ্ঞান, তার প্রেম ভালোবাসা, সে দেবে তার মনের বুভুক্ষাকে আকুলতাকে ছড়িয়ে।

কবির কথায়

অগ্নি জ্বালো, আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো
যদি তাহা ভস্ম হয় বিশ্বময়

তবু

দূর কর শোক
মোর অগ্নিপরীক্ষায় ধন্য হোক
বিশ্বলোক অপূর্ব দীক্ষায়।

অমিত শিলংএ এসেছিল নিজ নতা ভোগের জন্য কিন্তু ভুলে গিয়েছিল জনতা না

থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায় এমন সময় রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলি—আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজলঘন ছায়ার চাদর লুটিয়ে, খবর পাওয়া গেল চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে—এই বার ঘনবর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলো খেপিয়ে কূলছাড়া করবে—এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্য চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মত চিত্ত আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমকে দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না। এরি মাঝখানে এল লাবণ্য, যার নামকরণ করেছিল অমিত—বন্যা—যে ছিল অনন্যা—আপনি স্বরূপে আপনি ধন্যা। তারপর জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক এক ভদ্ররমণীকে বিয়ে করবার জন্য খেপল—অচেনাকে চেনা করে নিতে চাইলে, কিন্তু মিতা ওকে চিনলে—রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জল সে নয়।

কোনদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস
ঝরা বকুলের ব্যথিবে আকাশ
সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো কিছু মোর পিছু রহিল সে
... ...
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায় হে বন্ধু বিদায়।

॥ ষোলো

এখন যে আখ্যায়িকার অবতারণা করব, সেটা নিছক জল্পনার আল্পনায় জড়ান রূপকথা নয়, ইতিহাসের কাহিনীও বটে। কামরূপ কামাখ্যার মেয়েকে নিয়ে অনেক কল্পনাই উধাও হয়েছে, তারা লাস্যময়ী, তারা হাস্যময়ী, তারা সুন্দরী, তারা রূপসী, তারা শুধু তনুমন হরণ করে না, তারা 'পলক্ পলক্ লহু চোষে'। এই মোহিনীরা নাকি 'ভোজবাজির ম্যাজিক জানে, তুক্‌তাক্ করে মন্ত্রতন্ত্রের বেড়াজালে পুরুষদের ভেড়া বানায়, রাতে রাতে গাছ চালিয়ে শত যোজন দূরে চলে যায়, আবার তারাই ক্ষেত্রপাল অসিতাঙ্গ ভৈরবদের সঙ্গে বেড়ায়, পঞ্চ মকারের উত্তরসাধিকা তারা, ডামরী ঝামরী ডাকিনী যোগিনীদের সঙ্গিনী। উষা, রুক্মিণী, ভানুমতী, বেহুলাকে কামরূপ-কন্যা বলেই অনেকে গণ্য করেন। উলূপী, হিড়িম্বা, চিত্রাঙ্গদা, ঠিক কামরূপের না হলেও পাশের দেশের লোক। আসলে কামরূপ আর্য্য সংস্কৃতির পূর্ব দিকে বিস্তৃতির কেন্দ্র হলেও মাতৃতন্ত্র প্রধান (matrilenial) আদিবাসীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় নি। তার উপর পরবর্তী কালে তান্ত্রিক আচার বিচার উচাটন বশীকরণের নানা খ্যাতি-কুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাজতরঙ্গিণীতে পড়ি, কাশ্মীরের যুবরাজ মেঘবাহন কামরূপের রাজার মেয়ে অমৃতপ্রভার স্বয়ম্বরে চলেছেন। মেঘবাহন শুধু কন্যাকেই গ্রহণ করেন নি, তার সঙ্গে ভগদত্তবংশীয় রাজছত্রটিও নিয়ে যান। দণ্ডীর দশকুমারচরিতে কল্পসুন্দরী নামে আর-এক কামরূপ-কন্যার কথা পাওয়া যায়। নেপালের লিচ্ছবীবংশীয় এক রাজাও 'ভগদত্তরাজকুলজা' রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন। কাশ্মীরের কিংবদন্তী অনুসারে মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আক্রমণ করেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ-সংলগ্ন স্ত্রীরাজ্য অধিকার করতে যান। কিন্তু বুরঞ্জীমতে সেখানকার ঐ প্রমীলা রাজ্যের স্ত্রীলোকদের যৌবন 'কাশ্মীর সৈন্যের চিত্ত চঞ্চল করেছিল' বলে আর বেশিদূর এগুতে তিনি সাহস করেন নি। কামরূপীয় মেয়েদের ছলাকলা যে সারা ভারতবর্ষে প্রবাদের মত ছড়িয়ে পড়েছিল তার আর-একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই যে মীরজুমলা বিধ্বস্ত হবার পর আওরঙ্গজেব যখন জয়সিংহ-পুত্র রামসিংহকে কামরূপ-বিজয়ে পাঠান, তখন রামসিংহ

শিখগুরু তেগ্ বাহাদুর ও আরো পাঁচ জন সাধুকে সঙ্গে নিয়ে আসেন—যাতে তাঁরা সৈন্যদের উপরে কামরূপ-কুমারীদের কামকলার প্রভাব ব্যাহত করতে পারেন।

রাধা, রুক্মিণী, কুরঙ্গনয়নী, জয়মতী, কমলকুমারী, ফুলেশ্বরী, মদাম্বিকা সর্বেশ্বরী, রমণীগাভরু, মূলাগাভরু, কনকলতা প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নাম। সতী জয়মতীর কথা কামরূপে ও উত্তর বাংলার ঘরে ঘরে আজও গীত হয়। এঁর স্বামী রাজ্যচ্যুত হয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন, বলে যান—একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় পেলেই খবর দেব। রাণী দিন গোনেন। বিপক্ষের দল মারমুখী হয়, তাঁকে উত্যক্ত করে, রাজার গন্তব্যস্থলের হদিস বলে দিতে। ক্রমশঃ সেটা অত্যাচার ও নির্যাতনে দাঁড়ায়। রাজকুলবধূ কিন্তু নিশ্চল মূক অটল। সতী বললেন না পতির কোনো কথা—নিঃশব্দে প্রাণ দিলেন তিনি। মহারাজ রুদ্রসিংহ উত্তরবঙ্গে রংপুরে এই সতীর স্মৃতির সম্মানে বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করিয়ে দেন, নাম যার জয়সাগর এবং তারই পারে জয়দেউল নামে দেবতার মন্দির।

আর-এক মহিয়সী মহিলার নাম শোনা যায় চারণদের কাহিনীতে। কিংবদন্তী যে, সেবার দেশজুড়ে লেগেছে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ—সব গেছে শুকিয়ে, হেজে মজে পুড়ে। রাজা ম্রিয়মাণ, সভাসদরা স্তব্ধ, যাগযজ্ঞ হোমপূজা সবই বিফল, পর্জন্যদেব তুষ্ট হন না—অগ্নিদগ্ধ দিন এগিয়ে চলে। রাণী কমলা ছিলেন ভক্তি-মতী—তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে—রাজাকে ডেকে বলেন—এ হচ্ছে দেবতার অভিশাপ, একমনে তাঁর করুণা ভিক্ষা কর, সবচেয়ে তোমার যা প্রিয় তাই উৎসর্গ কর—সুজলা সুফলা হক দেশ। সেই রাত্রেই রাজা স্বপ্ন দেখলেন—বরুণ দেবতা বলছেন—বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাও এবং সেইখানে আহুতি দাও তোমার ঐ প্রিয়তমা মহিষীকে—তাহলেই জলে ভর্তি হবে ঐ পুষ্করিণী, দুঃখ-দুর্দিনের হাত থেকে খেয়ে পরে বাঁচবে তোমার প্রজারা, অন্ন হবে বহু।

স্বপ্ন ভেঙ্গে রাজা চমকে উঠলেন—সেকী, এও কি সম্ভব! না, না, তা হতে পারে না—তাঁর অতি আদরের প্রিয়তমাকে কোন্ মুখে তিনি বলি দেবেন। কিছু বলেন না তিনি। মহারাজ গম্ভীর বিষণ্ণ চিন্তাকুল, সভাসদরা মুহ্যমান, বাইরে প্রজাদের আর্তনাদ কোলাহল—জলের ব্যবস্থা কর মহারাজ, তৃষ্ণার জল চাই এক গণ্ডুষ। রাণী কাতর হয়ে পড়েন, রাজা আর থাকতে পারেন না, বলে ফেলেন স্বপ্নের কথা। রাণী কমলা হেসে বলেন—এত বড় সৌভাগ্য হবে আমার। রাজা আকুল হয়ে বলেন—স্বপ্ন মিথ্যা, না, না, হতে পারে

না। রাণী বলেন—মহারাজ, ভুল বুঝো না, এ হল দেবতার ডাক—এই তুচ্ছ দেহের বিনিময়ে যদি হাজার হাজার প্রজার প্রাণরক্ষা হয়, তবে কেন অমত কর প্রভু। দলে দলে শোকার্ত প্রজারা নিজেরাই দীর্ঘিকা খোঁড়ে—দৈবজ্ঞরা শুভক্ষণ গণনা করে দেয়—রাণী আস্তে আস্তে নামেন তার গহ্বরে—যেন মেদিনী গ্রাস করছেন কর্ণের রথচক্রকে—জনকনন্দিনী নতুন করে পাতাল প্রবেশ করছেন। তারপর হঠাৎ উঠল জলের কলরোল—যেখানে এতদিন মাটি কেটেও একফোঁটা জল বেরোয় নি সেখানে কলস্বনা ভোগবতী, পাতালগঙ্গার বন্ধন ছেড়ে কোলে নিলেন কন্যাকে। মিলিয়ে গেল অনন্তের রসসীমানার রহস্যসাগরে কমলকুমারী। কিন্তু মানুষের অজর মন থেকে আজও মিলিয়ে যায় নি তাঁর নাম।

আর-এক কামরূপ-দুহিতার কথা বলেই এই আখ্যায়িকা শেষ করব। এঁর নাম রাণী ফুলেশ্বরী, বড় কুমারী বা প্রমথেশ্বরী দেবী। এঁকে অনেকে বলেন যে ইনি আসামের নুরজাহান। অসমীয়া সমাজে রাজা রুদ্রসিংহ শুধু একজন পরাক্রান্ত আহোম নৃপতিই ছিলেন না, তিনি সঙ্গীত, সাহিত্য, কলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আসামে 'পাখোয়াজ' বাদ্যযন্ত্র তিনিই প্রচলন করেন। উত্তরবঙ্গে রংপুর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। করতোয়ার পারেও সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির চেষ্টা তিনি করেছিলেন কারণ তাঁর মনে বোধহয় প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সীমানার কথা জাগত—"নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রি ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম, করতোয়া সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্কর বারিণী।" সেই সময় বাংলায় নবাব মুর্শীদকুলী খাঁর আমল। তিনি আসাম ও বাংলার বহু সামন্ত ও স্বাধীন নরপতির কাছে দূত পাঠান—মুঘল সার্বভৌমতার বিরুদ্ধে অভিযানের আশায়। এইরূপ একটি দৌত্যের ফলেই আমরা 'ত্রিপুরা দেশের কথার লেখা' নামে একটি অসমীয়া বুরঞ্জী পাই—যার সাহিত্যিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিশেষ মূল্য আছে। এই সময়েই রুদ্রসিংহের মনে জাগে যে, শক্তি সঞ্চয় করতে গেলে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়াই সমীচীন। মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব গোঁসাইদের কাছে তিনি মাথা নত করতে রাজী হন না। নদীয়ায় লোক ছুটল—নবদ্বীপই তখন পূর্ব ভারতের সংস্কৃতির কেন্দ্র—রাজার গুরুপদে বৃত হবার অধিকারযোগ্য এমন কোনো শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় কি-না। মাতৃসাধক তন্ত্রসেবী কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ রাজী হলেন কামরূপে আসতে। কিন্তু রাজা তাঁর ছোট্টখাট্ট চেহারা দেখে ভাবলেন এর দ্বারা বুঝি শক্তিপূজা হবে না। ফিরে এলেন ন্যায়বাগীশ ক্ষুব্ধ হয়ে—ধরণীও নাকি ক্ষুব্ধ হয়ে দুলতে থাকে,—ভূমিকম্পেই ভূমাতা কি জানালেন

কলকাতায় ফিরে চলেছি কবিতীর্থে এক রাত্রি কাটাতে।

ধূমায়িত চায়ের আসরেই ঝড় ওঠে ভারী এটাই জনশ্রুতি, নিস্তরঙ্গ হিমশীতল কাফির পেয়ালাতেও তার রেশ এসে থামে—তার প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিনকার নিদাঘতপ্ত ভাদ্রের ভরা মধ্যাহ্নে। বন্ধুবরের আহ্বানে বেশ আরাম করে ঠাণ্ডা কফি খাওয়া হচ্ছিল, কথা উঠল—কলকাতা বড় একঘেয়ে লাগছে, সবাই মিলে একদিন কোথাও ঘুরে এলে মন্দ হয় না—স্থান কাল পাত্র অনুকূল, ফিরে আসা গেল বিশ বছরেরও আগেকার হারিয়ে-যাওয়া ছাত্রদিনের মাঝে, ভুলে যাওয়া গেল—কর্মের কলরবে ক্লান্ত আনন্দহীন বৈচিত্র্যহীন জীবন সঙ্কীর্ণ—যার গণ্ডী কূপমণ্ডুকতায় ভরা. হাজারী মনসবদারের খবরদারী ওজন-করা কথা, পালিশ-করা ভদ্রতা, এটিকেট কায়দাকানুন, ছোট্ট একটি পরিধি—বাইরে থেকে দেখতে বেশ নিরেট ও ভরাট, ভিতরে একেবারেই ফাঁপা, গণ্ডীর ভিতর গণ্ডী চাকার ভিতর চাকা—এককথায় যা কর্তার ভূতের মত নাড়েও না, ছাড়েও না। কে জ্বালাবে সেই সৃষ্টি-করা দৃষ্টিপ্রদীপ, কে জানাবে যে আমাদের এই স্বার্থক্ষুব্ধ পরিবেশের বাইরে আছে একটা বিপুলা পৃথ্বী, রূপে রসে রঙে রঙীন, শ্যামকান্তিময়ী ধাত্রী ধরিত্রী তন্বী শ্যামা যার শাশ্বত আবেদন মনকে করে চঞ্চল, পথভোলাকে করে পাগল, ঘর ছাড়াকে উন্মনা। কে বলবে আছে দুঃখ কষ্ট অনশন অনটন মন্বন্তর রোগশোক তাপ; আছে মানুষ, আছে সমাজ, আছে মন। শুধু কি আত্মপ্রসাদের আত্মপ্রবঞ্চনা তার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে চলবে?

যাক সে কথা—যাওয়া যায় কোথায়? ডাক্তার বন্ধু ছিলেন—প্রাণখোলা আত্মভোলা খাঁটি মানুষ, বললেন—চলুন, যাওয়া যাক শান্তি-নিকেতনে—সামনেই পূর্ণিমাপক্ষ কবিসদনে যাওয়ার পক্ষে প্রশস্ত। আমরা সবাই বললুম, তথাস্তু—কতকটা অন্তরের আগ্রহে, কতকটা ভদ্রতার খাতিরে। রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে বাঙালীর একটা দুর্বলতা কোথায় আছে যেন! রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতটুকু জানি—শুধু কি তিনি গানের ভাণ্ডারী, কথার কাণ্ডারী। কবিতীর্থে যেতে গেলে তীর্থযাত্রীরই মন চাই—যেখানে গেলে শ্রদ্ধাবনত মন বলবে—যা দেখতে চাই তা দেখলুম চোখ মেলে—"পাপৌ নিমেষালসপক্ষ্মপংক্তি রূপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্।"

যথারীতি কথাটা আমরা সবাই ভুলেই বসে আছি। কিন্তু ডাক্তার

আমাদের মত সহজ লোক নন, কর্মিতকর্মা, তখনই রথীবাবুকে চিঠি লিখে ঠিক করে ফেলেছেন। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় তাঁর আমন্ত্রণ লিপিসমেত হাজির। বন্ধুবররা উঠে পড়ে লেগে গেলেন দস্তুরমত বন্দোবস্ত করতে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাড়া দেন—টেলিফোনের ঘণ্টা ওঠে বেজে—নিশ্চয়ই যেতে হবে মশাই, কোনো কথা শোনা হবে না কিন্তু। যাত্রার ও রথের ব্যবস্থা হল, এ দশরথ নয় যে যত না চড়ব, তার চেয়ে বেশি ঠেলতে হবে। নানান দিকে নানান বাধা ঝঞ্ঝাট, কাজ আছে, কাজের তাড়া আছে, শরীর আছে, মন আছে, আবার মনের হাল ধরে বসে আছেন গৃহিণী সচিব সখি মিথঃ যাঁদের unlimited veto power. 'দুর্গাস্তরতু ভদ্রাণি' বলে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। শনিবার সায়াহ্নে শনৈশ্চরকে স্মরণ করে পাড়ি জমান হল হাওড়া স্টেশনে। জুটলাম নয় জন মাতুলসমেত নবরত্ন, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা যেন নতুন করে বসল। কালিদাসের কালে, রেবানদীর ধারে তবু নিপুণিকা চতুরিকার দেখা মিলত, হয়তো-বা রাজার চিত্রশালে, উদ্যানবীথিকায়, আলবালের অন্তরালে, আমরা কিন্তু পথি নারী বিবর্জিতা।

ক্ষণকালের জন্য পথচারী হলেও আমরা খাঁটি মেটিরিয়ালিস্ট বাস্তবতন্ত্রী, শুধু কাব্যকথায় পেট ভরে না জেনেই বন্ধুবর সঙ্গে এনেছিলেন প্রচুর খাবার উপকরণ—চৈনিক 'খাওসুয়ে' হইতে বাঙালীর দৈনিক ভর্জিত মৎস্য, পর্যাপ্ত পোলাও কালিয়া সন্দেশ রসগোল্লা দই রাবড়ী। দুঃখ হল কলিকালে উদরাগ্নির তেজ ও বীর্য নেই। সুহৃদ্বরের দরাজ মন উদার আতিথ্য, কথার ভিতর রস আছে হুল নেই, সদালাপী মিঠে লোক—A violet by a mossy stone কিন্তু half hidden from the eye নন। পথের বন্ধুদের সবাইকেই নমস্কার জানাই, এ হচ্ছে আনন্দের ঋণ।

পথের সাথী নমি বারম্বার
পথিকজনের লহ নমস্কার।

হাওড়া থেকে বোলপুর মোট ৯৯ মাইল। পশ্চিম বাংলার ঝোপ জঙ্গল পচা ডোবা ম্যালেরিয়া ছাড়া বর্ণনাযোগ্য কিছুই নেই। ব্যাণ্ডেলে এক কাপ করে চা চলল—একটু সরস হয়ে তাসের আসর গরম হয়ে উঠল। বর্ধমানে ভূরিভোজন। রায়গুণাকরের বর্ধমানে এখনও সীতাভোগ মিহিদানা পাওয়া যায়, কিন্তু সে বিদ্যাও নেই, সুন্দরও নেই, মনের ভিতর সুড়ঙ্গ কাটা হয় না।

বীরভূম, চণ্ডীদাস, রজকিনী, জয়দেব, পদ্মাবতী, অজয় ময়ূরাক্ষীর দেশ আবার শক্তিসাধনায় আগমনিগম তন্ত্রবাদেরও পীঠস্থান 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত

ধরণীতলে'। শুধু চণ্ডীদাস ও বৈষ্ণব মহাজনরা 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর' এনেছিলেন তা নয়, তন্ত্রসাধনার বহু রোমাঞ্চকর ইতিহাসও শোনা যায়।

রাত সাড়ে বারোটায় বোলপুর—স্তব্ধ রাত্রে শরতের শুভ্র আকাশে নবমল্লিকার মালার মত ফুটে উঠেছিল—সারদার আবাহন। কয়েকটা Cycle rickshaw নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের পথ দিয়ে. ভুবনডাঙার মাঠ বেয়ে, রাত্রির স্বচ্ছ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যাত্রা, পূর্ণিমা পেরিয়েছে, কাকজ্যোৎস্নার প্লাবনে একটা মৃদু রহস্য-ঘেরা অপূর্ব অনুভূতি। দূরে বনফুলের মধুগন্ধ, বৃক্ষবনস্পতির দীর্ঘছায়া। আবছা-আলোর অন্ধকারে, বাংলোগুলিকে মনে হচ্ছিল মরুপ্রান্তরের ওয়েসিস—প্রেয়ারির মাঝে ক্যাম্পাস্। মনে পড়ল সাত বছর আগের কথা। সুদূর সাগরপার থেকে ছুটির অবকাশে ফিরেছি দেশে। কবিগুরু তখন সবে বিসর্প রোগ থেকে উঠেছেন। কবিপ্রণাম করবার জন্য সপরিবারে শান্তি-নিকেতনে উঠলাম। কবিকে দেখলাম যেন বাজপড়া বনস্পতি—তবু স্তব্ধ শান্ত আত্মসমাহিত। একটু হেসে বললেন—আমার আর কি আছে—কি দেখতে এসেছ? আমার শিশুকন্যাকে আদর করে বললেন—আমাকে দেখে ভয় করছে? সেই শেষ দেখা।

অতিথি আবাসে পৌছান গেল সরবে ও সদলে। শেষ প্রহরের ঘণ্টা বাজার মাত্র দু-একঘণ্টা বাকী। অপরাপর অভ্যাগতেরা হয়তো আমাদের আগমনীর সাড়া পেয়ে সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। কেউ কেউ বেরিয়েই পড়লেন—চাঁদের আলোয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আলাপ হল। তারপর সতরঞ্চি বিছায়ে শয়ন। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁদের নাসিকাধ্বনির দ্রুতমৃদুমধ্যমন্থর তাল বিচিত্র তান রাগিণীর সৃষ্টি করতে লাগল। তারই মধ্যে ঘুমের একটু মিঠে আমেজ। রাত্রির শেষ প্রহর অদ্ভুত প্রহেলিকাময়, একটা রহস্যময় ঘন শীতলতায় দেহের উত্তাপ ক্ষয়িত হয়ে আচ্ছন্নতা নেমে আসে। আকাশের জ্যোতির্লোকে দিগ্‌ভ্রান্তকে পথ দেখাবার জন্য জ্বলছে শুকতারা। সপ্তর্ষি বিদায় নিয়েছেন। তার কিছু পরেই সোনার তির্যক রেখা মুখের উপর পড়ে ঘুম দিল ভাঙিয়ে—জাগো জাগো! প্রত্যেক দিন যদি এমনি করেই জাগি। 'অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ।'

প্রাতঃকৃত্য সমাধার পরই এল উত্তরায়ণে চা খাবার নিমন্ত্রণ। রথীবাবু ও তাঁর নন্দিনী আমাদের আদর আপ্যায়ন করলেন প্রচুর। কবির গান মনে পড়ল—

তুমি উশর সোনার বিন্দু, প্রাণের সিন্ধুকূলে
কবির ধেয়ান ছবি, পূর্বজনম স্মৃতি...।

প্রথমেই যাওয়া গেল রবীন্দ্রভবনে—সযত্ন সংরক্ষিত পৃথিবীর মনীষীদের অভিনন্দন, নানা ভাষায় অনূদিত কবির গ্রন্থগুলি, কবির সহস্তে-আঁকা ছবি, রংএর বিচিত্র মেলা। উদয়ন, কোণারক, পুনশ্চ, উদীচি দেখে দাঁড়াতে গেল শ্যামলীর কাছে—ছোট্ট মাটির ঘর

আমি পাকা করে গাঁথিনি ভিত—
আমার মিনতি ফাঁদিনি পাথর দিয়ে তোমার দরজায়
বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে
যে মাটি পড়বে গলে শ্রাবণধারায়

দেবতাপাড়ায় তিনি বেদের মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, 'পথের ধারে গাছ তলাতে তোমার বাসা শ্যামলী।'

শ্রীযুক্ত কৃপালনী আমাদের নিয়ে এলেন শ্রীনিকেতনে। এলম্‌হার্স্ট দম্পতীর অর্থসাহায্যপুষ্ট শ্রীনিকেতন দেশের কাছ থেকে বেশি কিছু পায় নি এটা আমাদের শ্লাঘার বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথকে লোকে জানত—বড়ঘরের ঘরোয়ানা ছেলে, আঙুর বেদানা খেয়ে পরিপুষ্ট নিটোল কান্তিমান পুরুষ—তাঁর পক্ষেই চাঁদের আলো, দখিন হাওয়া নিয়ে সৌখীন কাব্য করা শোভা পায়, দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ তাঁর নেই। তিনি নিজেই বলতেন আমার দুর্নাম ছিল ধনীর সন্তান তার চেয়েও বড় দুর্নাম কবি। যাঁরা একথা বলতেন বা এখনও বলেন, তাঁদের দুর্ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর পুরুষকে তাঁরা চেনেন নি। দেশের জন্য কি মমত্ববোধ তাঁর ছিল, সব দিক দিয়ে তাকে গড়ে তোলবার, মাধুর্যে সৌন্দর্যে রসায়িত করবার চেষ্টা ছিল, তার ইতিকথা আজ স্তব্ধই থাকুক। কোথাও কোন parochial outlook নেই, স্লোগান নিয়ে মারামারি নেই, দেশহিতৈষিতার নামে সংক্ষুব্ধ আত্ম-বিক্ষোভের সংঘাত নেই, নীরবে নিভৃতে নিজের মত ও পথ বেছে নিয়ে কাজের আরম্ভ—যেখানে কর্মনাশা ভেদবুদ্ধির সর্বনাশা বিস্তার নেই। কবির 'স্বদেশী সমাজের' পরিকল্পনার কথা কে না জানেন। এই দুর্গত শ্রীহীন হ্রীহীন নিরানন্দ ব্যর্থ দেশে মহালক্ষ্মীর পাদপীঠ পরিকল্পনা প্রথম এই কবি-মানসেই এসেছিল

অন্ন চাই প্রাণ চাই, আলো চাই
চাই মুক্ত বায়ু, চাই স্বাস্থ্য চাই বল
আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু সাহসবিস্তৃত বক্ষপট

আত্মবিস্মৃত আত্মঘাতী বাংলাদেশে এই বিশ্বাসের ছবি কবি প্রথমে এনেছেন এবং তাই নিয়ে নিজেই experiment করেছেন। সামান্য এ চেষ্টা কিন্তু একজনের আপ্রাণ চেষ্টা—অন্ধকারে মাটির প্রদীপে ছোট্ট দীপশিখা—আদর্শের বর্তিকা। তিনি বলতেন, "শুধু কিছু বিলিতি বেগুন আলু ফলিয়ে, চিরকেলে তাঁত চালিয়ে শতরঞ্চি কাপড় বুনোনই বাঁচবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানুষ আনবে বিজ্ঞানের শক্তি গ্রামে গ্রামে। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।" বড় দুঃখেই তিনি বলেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি, আমার জীবিতকালের সঙ্গেই যদি তার অবসান হয় তাতে আমার অগৌরব, না তোমাদের।

পূর্ব ও পশ্চিমের নূতন ও পুরাতন একটি dynamic integration সহজ চলমান মিলন তিনি আনতে চেয়েছিলেন আমাদের জীবনে। যেখানে সব সত্যকেই সরলভাবে গ্রহণ করতে পারা যাবে প্রাণের প্রাচুর্য দিয়ে। প্রাণশক্তি অর্জন করবে নিজের পাথেয়।

শ্রীনিকেতন থেকে ফিরে এসে যাওয়া গেল গ্রন্থাগারে। সিংহসদন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, শিশুভবন দেখে চীনাভবনে যাওয়া গেল। ভারতবর্ষ যুগে যুগে দান করেছে তার গুরুকে

পদ্মাসন্ আছে স্থির
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন
মৌন যার শান্তি অন্তঃহারা
বাণী যার সকরুণ সান্ত্বনার ধারা

সকালবেলা কলাভবনের অবগুণ্ঠন খোলে না, আমাদের মত অরসিক ও অব্যাপারীদের জন্য। সঙ্গীতভবনের গানের ক্ষীণ রেশ দূর থেকেই শোনা গেল। অজন্তার অনুকরণে মাটির ঘরের উপর ফ্রেসকোগুলি জীবন্ত ও ভাস্বর। প্রাগৈতিহাসিক মহঞ্জদড়র সিলগুলির অনুলিপি বড়ই সুন্দর লাগল। বাইরের কংক্রিট স্ট্যাচুর একটি ও অতিথি আবাসের সামনের Plaqueটি এপস্টাইনের বিখ্যাত 'নিশীথিনী'কে স্মরণ করাইয়া দেয়। ফিরে এসে ছাতিমতলায় কিছুক্ষণ দাঁড়ান গেল। জানি না মহর্ষি কি পেয়েছিলেন এখানে। অবনীন্দ্রনাথের চমৎকার

ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় 'দুই সন্ধানী'র গল্প যাঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছে—শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী, "দারুণ দ্বিপ্রহরের রোদ শিবিকা-বাহকেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, হঠাৎ মহর্ষিদেব দেখলেন সামনে দিগন্তপ্রসারিত মাঠ আর তারই মাঝখানে একটি ছায়াতরু। কী তাঁর মনে হয়েছিল জানি না—হয়তো তিনি দেখেছিলেন যিনি 'বৃক্ষোইব দিবি তিষ্ঠত্যেক' আনন্দরূপং অমৃতম্ যদ্বিভাতি। প্রথম সন্ধানী উদারকণ্ঠে বললেন, 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' দ্বিতীয় সন্ধানীও সেই কথাই কত সুরে কত গানে কত কাজের মধ্যে বলে গেলেন—'যত্র বিশ্বং ভবেত্যেকনীড়ম্' যেখানে বিশ্ব হবে একটি নীড়।" দুই সন্ধানীর পিতাপুত্রের মিলিত ইচ্ছা নিয়েই এই আনন্দলোকের সৃষ্টি। আর-এক জন মুক্তচিত্ত পুরুষের সাধনাও এখানকার সপ্তপর্ণার প্রতি পত্রে লেগে রয়েছে। একদিনের উপাসনার কথা—বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ আচার্য। উপাসনা করতে গিয়ে তিনি নির্বাক স্তব্ধ হয়ে মনের গভীরে হারিয়ে গেলেন। মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ হল না, শুধু অনির্বাণ দীপশিখার মত শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল—অন্তরের আন্তরিক যোগ প্রকাশ পেল মুখের এক অনির্বচনীয় দীপ্তিতে।

দুপুরবেলা আবার উত্তরায়ণে মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ। চর্বচুষ্য-লেহ্য-পেয় বহুভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম আরাম করে ফিরে এলেম অতিথি আবাসে। বাস দাঁড়িয়েছিল আমাদের স্টেশনে নিয়ে যাবে বলে। সবাইকে প্রীতি নমস্কার ধন্যবাদ দিয়ে ও মনে মনে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' ও তার অধিদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। বিশ্বভারতীর কি ভবিষ্যৎ, এখানকার শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা, শ্রীনিকেতনের আয়োজন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করবার অধিকার হয়তো আমাদের নেই—তবে কবির আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ, তাঁর স্বপ্নমূর্তি নিতে চেয়েছিল এমন এক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে—সে কথা কবিমানসের উত্তরাধিকারী আমরা ও ভবিষ্যৎ দিনের ছেলেমেয়েরা যেন না ভুলি

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

ফেরবার পালা সংক্ষিপ্ত। দুর্গোৎসবের পরে বিজয়া দশমীর দিনে নিরঞ্জনের পর যেমন মনের অবস্থা হয় তেমনি একটা ক্লান্ত করুণ উদাসী ভাব। বর্ধমানে সীতাভোগ মিহিদানার সঙ্গে চা-পর্ব—মাতুলের বিদায়। রাস্তায় এক অপূর্ব

দৃশ্য—মাইলের পর মাইল জুড়ে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর শুভ্র প্রলেপ কাশফুলের বনে। চোখের অঞ্জনে রঞ্জনার ধারা—শ্বেত চন্দনের ছাপ। ট্রেন পৌঁছল হাওড়া স্টেশনে—বর্ষণমুখর তিমির নিবিড় সন্ধ্যা—আষাঢ় নেমেছেন আশ্বিনে শ্রাবণের উতল ধারা বেয়ে। ভিজতে হল বেশ—

তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নূতন তীর্থ রূপ দিল জগতে
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেইখানে মোর প্রণতি দিলাম আনি।*

॥ আঠারো

আজকাল আমরা হুট করে কথা না বলে চব্বিশ ঘণ্টায় ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে আসছি, কিন্তু এই সে দিনেও পুরী বা কাশী যাওয়াই মধ্যবিত্ত বাঙালীর ছিল বিলাস ও প্রয়াস। তার আলাপ আয়োজন চলত বহুদিন থেকে, তার গল্প হত শতমুখী, রথ দেখা আর কলা বেচা এক সঙ্গে। শরীর খারাপ কার নয়, অবসাদও আসে, বিশ্রামও দরকার। ছুটিছাটা না মিলুক পুজো বড়দিন ছিল, বাড়িতে মা মাসীদের তীর্থযাত্রার মোহ ছিল। তাই রসপিপাসু ধর্মপিপাসু স্বাস্থ্যকামীদের দেখা যেত বালুবেলার চক্রতীর্থে না-হয় কাশীর ঘাটে-ঘাটে দশাশ্বমেধে মণিকর্ণিকায়—কালভৈরবের ঝাঁটা সত্ত্বেও তাঁরা অর্ধচন্দ্র দিতেন না—তিল তিল করে তিলেভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরে তিলোত্তমেরই খোঁজ করতেন।

আজও মনে পড়ে বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি। ঠাকুমার আটকে বাঁধা হল জগন্নাথের মন্দিরচুড়োয় আকাশস্পর্শী স্পর্ধায়—ফলত্যাগ হল—কামরাঙা—পাণ্ডারা জয়ধ্বনি করলে, কিঞ্চিৎ স্বর্ণরোপ্যখণ্ড যথাসম্ভব গোত্রনামে ব্রাহ্মণায়

(১) শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ (২) ডাঃ জিতেন দত্ত (৩) শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ঘোষ (৪) শ্রীযুক্ত অরুণকুমার রায় (৫) শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত. রায় (৬) শ্রীযুক্ত বীরেন মজুমদার (৭) শ্রীযুক্ত বি. সি. মল্লিক (৮) শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মুখার্জি (অধুনা পরলোকগত)

হাত বদল হল, প্রাপ্তি হল কিঞ্চিৎ প্রসাদ। তখন বলরামের রাজভোগই ছিল মুখরোচক ও স্বাদু—সেই লোভই আমাদের লাভের কারণ হত। স্থগিত থাকত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কবে দারুব্রহ্মকে কিভাবে পেয়েছিলেন তার গল্প, জগন্নাথদেব সুভদ্রা ও বলরামের কে, কবে তাঁরা গুণ্ডিচা বাড়ী যান এবং কেন। বড়রা তর্ক করেন এখানকার দেবতারা বিধ্বস্ত বৌদ্ধযুগের প্রতীক, কোণারকের ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গশিল্পের রূপ কী, এই রূপচর্চায় eroticism এল কেন—মন্দিরে মন্দিরে মুগ্ধ শিল্পীর এই লীলাবৈভব কিসের জন্য, মিথুনকামনার লাজনম্র দৃষ্টি কেন?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে—কে সে যে বলেছিল উদাত্তসুরে—

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন কনক মাণিক্যবিভবম্
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজন কাম্যাম বরবধূম
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীত চরিতো
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে

* * *

রথারূঢো গচ্ছন্ পথি মিলিত ভূদেবপটলৈ
স্তুতি প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ
দয়াসিন্ধুর্বন্ধু সকল জগতাং সিন্ধু সুতয়া
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।

দেখা দাও, দেখা দাও—এই ত পৃথিবীর মানুষের চিরদিনের কান্না। গম্ভীরা-লীলায় সেই খেলাই ত দেখালেন পরমপুরুষ মহাপ্রভু ভক্ত সুরদাসের কথায়।

অংগন ছীন ব্যাকুল ভঙ্গ
মুখে পিয় পিয় বাণী হে

আঠারো বছর ধরে রইলেন তিনি পুরুষোত্তমের মুখোমুখী হয়ে। তারপর এক-দিন ঝরাপূর্ণিমার ঝলমল রাত্রে শুনলেন—ডাকে যেন, ডাকে যেন সিন্ধু মোরে ডাকে যেন! কোন্ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ডাক এল। নীল সমুদ্রের বারিধৌত তরঙ্গের মধ্যে মিলিয়ে গেল আলিঙ্গনোচ্ছত ধূলিধূসরিত প্রসারিত বাহু, হেমগৌর-তনু, নয়নে দরবিগলিত ধারা। কেউ বললেন—তা কেন, মন্দিরের বিগ্রহের মধ্যেই তিনি মিলিয়ে গেলেন।

যে বা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত

হ্যাঁ অদ্ভুত চরিত্রই বই কি

চৌদ্দশত সাতশক মাস সে ফাল্গুন

পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ

শ্রীবাসের অঙ্গনে অদ্বৈতাচার্য তখন কীর্তন করছেন তাঁর মনে লাগল সাড়া—মিশ্র হইল আনন্দে বিহ্বল। শচীমা নাম রাখলেন নিমাই—লোকে বললে চাঁদের মত ছেলে নাম হক গোরাচাঁদ, গৌর, গৌরাঙ্গ। নিমাই টোলে যায়, অদ্ভুত শ্রুতিধর। ব্যাকরণ ন্যায় দর্শন অলংকার কাব্য প্রত্যেক শাস্ত্রেই নিমাই হলেন অসাধারণ পণ্ডিত। কেশবকাশ্মিরী এলেন, বিচার হল, বিশ্লেষণ হল, ঈশ্বরপুরী এলেন, গদাধর পাদপদ্মে পাষাণী শিলার পাশে ঢলে পড়ল অবশতনু, কানে দিলেন ইষ্টমন্ত্র, ব্যাস সূত্রের ব্যাখ্যা করলেন সার্বভৌম, কিন্তু কাকে বোঝাবেন তাঁরা—গাঢ়ং গাঢ়ং নায়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ—নীলাচল থেকে দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণাত্য থেকে বৃন্দাবন

অন্যের হৃদয় মন আমার মন বৃন্দাবন

মনে বনে এক করে মানি

এই গুহ্যতম লীলার সাক্ষী নীলাচল, সাক্ষী স্বয়ং জগন্নাথদেব, সাক্ষী রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখী মহান্তী, মাধ-*, ছয় শিষ্য, ছয় গোস্বামী।

একদিন সন্ধেবেলায় স্নান সেরে মহাপ্রভু বসে আছেন, রায় রামানন্দ এসে হাজির সাধ্যনির্ণয় কি—স্বধর্মাচরণ বিষ্ণুভক্তি, ইত্যাদি?

প্রভু বলেন— এহ বাহ্য আগে কহ আর।

রায় বলেন—গীতার নবমে অধ্যায় বলেছে—কৃষ্ণে কর্ম সমর্পণ যৎকরোসি যদশ্নাসি—

উহুঃ আগে কহ যাব

আচ্ছা, ভক্তি প্রধর্মহারিণী, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি—ব্রহ্মভূতো প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

প্রভু বললেন—তাও নয়

তবে জ্ঞানবর্জিতা ভক্তি, জ্ঞান শূন্যা—ভগবানের ঐশ্বর্য জ্ঞান যখন আর নেই—

টনক নড়ে—এহো হয়, আগে কহ আর

আচ্ছা প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম।

হ্যাঁ এ উত্তম

তবু কিন্তু রয়ে যায়—কারণ শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে হয়.

কান্তা প্রেমে—প্রেমাবিদ্ধোপদীপনম্.

যখন সন্ন্যাস লইনু ছন্ন হৈল মন
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন

সেইজন্যই দরকার—সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ। ভাবি সেকেলেই হই আর একালেরই হই, নবীনকিশোরই হই বা প্রবীণ তর্কচঞ্চু—এই কথাটাই যদি মনে থাকত—সমস্ত সত্যেরই চরম পরীক্ষা হয় একটি পরম সূত্রের মধ্যে দিয়ে—সেটি হচ্ছে মানুষ—সেটি ধর্মনিরপেক্ষই হক ধর্মসাপেক্ষই হক—মরা মরা করেও রামে পৌঁছন যায়—রাম রাম করেও মরা হওয়া যায়। জীবনে প্রয়োগ-বিদ্যাই সব। সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষই বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি, মুগ্ধমাধব, অক্লেশ কেশব। প্রেমসঙ্গতা থেকেই আসে অনন্ত মমতা, অনন্ত মমতা থেকেই সর্বত্র-সমতা—সাম্যরস বিধান—তটস্থ লক্ষণ।

এই ত গোবিন্দদাসের কেবল রস নিরমাণ।

॥ উনিশ

একটি ঐতিহাসিক চিঠির কথা বলেই পুরী অধ্যায় শেষ করি। পত্রটি পুরীর জগন্নাথদেবের পুরোহিত সেবাইত ও ভক্তদের দ্বারা ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলীকে লিখিত।

পত্রলেখকরা বলছেন "অধুনা আপনার শাসনে আমরা সর্বপ্রকারে সুখে আছি। আমাদের আন্তরিক কামনা এই যে—যেরূপ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা ধর্ম স্থাপিত করিয়াছিলেন সেরূপ আপনিও করিবেন এবং ইংরাজ বাহাদুরের সতর্কতায় আমাদের সকলের প্রাণ ও ধন রক্ষার সংবাদ শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবন, বারাণসী, রামনাথ, দ্বারিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে সকলে এখানে আগমন করিবেন এবং ভগবদ্দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। আমরা সকলে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে ইংরাজ বাহাদুরের শাসন চিরস্থায়ী হউক, শ্রীভগবান আপনাকে প্রত্যহ স্বচ্ছায়ায় স্থাপন করিয়া উত্তরোত্তর আপনার শ্রীবৃদ্ধি করুন এবং আমরা আপনার শুভার্থীরা আপনার শাসনে নির্ভয়ে জগন্নাথ দেবের সেবায় নিযুক্ত রহি।"

দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধের সময় পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির সম্বন্ধে ওয়েলেসলি

সেনানায়ক কর্নেল ক্যাম্বেল ও কমিশন মিঃ মেলভিলকে যে আদেশ দেন (Cons. 1 March 1804, No 46, Paras. 6-12) তাতে দেখা যায় যে যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখা, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বগ্রহণ, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার (most ample protection...with every mark of consideration and kindness) তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এ ছাড়া তাঁর নির্দেশ ছিল যে মন্দিরের বা মন্দিরসংক্রান্ত সেবাইত, পুরোহিত বা তীর্থযাত্রীদের কোনোরূপ অসুবিধা না হয়। "You will employ every possible precaution to preserve the respect due to the Pagoda and to the religious prejudices of the Brahmins and Pilgrims. You will furnish the Brahmins with such guards as shall afford perfect security to their persons, rites and ceremonies and to the sanctity of religious edifices." এ ছাড়া কঠোর নির্দেশ ছিল যে (১) জগন্নাথদেবের নামে উৎসর্গীকৃত বা সেবাইতদের দেবোত্তর সম্পত্তিতে যেন কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা না হয়; (২) ঐসব সম্পত্তি (স্থাবর, বা অস্থাবর) যেন সৈন্যদল কর্তৃক লুণ্ঠিত বিজেতার অংশ (Prize money) বলে গৃহীত না হয়; (৩) মারহাট্টা সরকারকে দেয় কর অপেক্ষা অধিক কর আদায় করা না হয়। যাত্রীদের নিকট থেকে প্রাপ্য পার্বণী সম্বন্ধেও ওয়েলসলি বিস্মৃত হন নি। তিনি একদিকে যেমন পাণ্ডাদের প্রাপ্যে হস্তক্ষেপ করতে সম্মত হন নি, অপর দিকে যাত্রীদের উপর অযথা পীড়ন না হয় সে বিষয়েও বিশেষ সতর্ক ছিলেন, অথচ তিনি শাসনভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডাদের সহানুভূতি হারাতেও রাজী ছিলেন না। এই বিষয়ে তাঁর অনুজ্ঞা উল্লেখযোগ্য: "Any measures calculated to relieve the exactions to which pilgrims are subjected by the rapacity of the Brahmins would necessarily tend to exasperate the persons whom it must be our object to conciliate. You will therefore signify to the Brahmins, that it is not your intention to disturb the actual system of collections of the Pagoda and at the sametime not to limit the powers···to make such arrangement with respect to that Pagoda or to introduce such a reform of existing abuses and vexations, as may hereafter be deemed advisable."

এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায় যে সুবিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

ইংরাজদের স্বপক্ষে পুরীর ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের একটি পত্র দেন। সম্পাদকেরা এই পত্রের মূললিপি অনুসন্ধান করে পান নাই, কিন্তু অন্যত্র তার উল্লেখ দেখেছেন। এমন কি ইংরাজদের স্বপক্ষে শুধু মর্ত্যের জগন্নাথ নন স্বর্গের জগন্নাথও রায় দিয়েছিলেন: "That the Brahmins at the Holy *temple* had consulted and applied to Juggernaut to inform them what power was now *to* have his temple under its protection and that he had given a decided answer *that the* English Government was in future to be his guardian."

মারহাট্টা রাজত্বে অত্যন্ত দরিদ্র ব্যতীত প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে ১১ টাকা করিয়া যাত্রিকর ও দুই টাকা করিয়া মন্দিরকর দিতে হত। ওয়েলেসলি যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই কর রহিত করিয়া দেন।

ওয়েলেসলিকে লিখিত পত্রের শেষে শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ইহাতে ধর্মজ্ঞান, কবিত্বশক্তি ও ভগবদ্ভক্তি মিলিত হয়ে ইহাকে শুধু সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে নি, এক অপূর্ব সহজ সাম্যমন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছে।

"ভোগোপি সাধয়তি যোগ ফলং হি যত্র, জাতিং
বিশোধয়তি ভোজনম ব্যবস্থা, এতাদৃগস্য মহিমা
পুরুষোত্তমস্য দাসীপদদ্বয়রজা· পুনন্তি দেবান্।
শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং গহনো হি পন্থাঃ বৃথানুধাবত কিং শ্রমেণ
ন্যগ্রোধমূলে লবণোদতীরে ব্রহ্মামৃত লোচনপেয়মস্তি।
কুক্কুরস্য মুখাদভ্রষ্টং যদন্নং পাবনং মহৎ, ব্রহ্মাদ্যৈরপি
ভোক্তব্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে।
যোগিনাং যো হৃদাকাশে বিদ্যুদ্বর্ণঃ প্রকাশতে
স এব দারুরূপেণ নীলাদ্রৌ ভাসতে মহঃ।
ব্রহ্মাদিশ্বপচান্তানাং যৎ প্রসাদান্ন ভোজনে ন চ
পংক্তে হি ভেদোস্তি জগন্নাথায় মঙ্গলং।"

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের এতাদৃশী মহিমা যে ভোগ ও যোগফল দান করে, ভোজন ব্যবস্থা জাতিকে শোধিত করে, দাসীর পদদ্বয়ের ধূলিকণাও দেবতাদের পবিত্র করে।

শ্রুতি ও স্মৃতির গহন পথে জ্ঞানিগণ বৃথাই ধাবিত হয়েছেন, এ পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? সমুদ্রতীরে বটবৃক্ষতলে লোচনপেয় অমৃতময় ব্রহ্ম রয়েছেন।

কুক্কুরমুখভ্রষ্ট পবিত্র মহান্ন যদি ভাগ্যবশতঃ লাভ হয় তবে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদেরও তাহা ভোক্তব্য।

যোগীদের চিত্তাকাশে যিনি বিদ্যুৎরূপে প্রকাশিত হন তিনি আবার কাষ্ঠরূপে নীলাচলে উদ্ভাসিত হন। যাঁহার প্রসাদান্নভোজনে ব্রহ্মাদি কুক্কুরাহারী পর্যন্ত সকলের শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয়—সেই জগন্নাথদেবের মঙ্গল হউক।

॥ বিশ

যুগ যুগ ধরে সারা ভারতবর্ষের হিন্দুর মনে কাশীর মহিমা প্রতিফলিত হয়ে এসেছে। গঙ্গার তীরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই শহরটির ঘাটে ঘাটে আমাদের মন আজও ঘুরে বেড়ায়। মণিকর্ণিকায় চিতার আগুন নেভে না, স্বয়ং মহাদেব ভৈরববেশে যমদূতের কাজ করেন, 'সন্ধ্যাবেলায়' ঘাটে ঘাটে পশারিণীর খোঁজে শুধু সোনার হরিণরাই বেড়ায় না, মুক্তিকামী মানুষের কান শ্রদ্ধাসহকারে শোনে হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার গল্প, শিবির উপাখ্যান, রন্তিদেবের কাহিনী, রাম-লক্ষ্মণের ইতিহাস, কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথির লীলা কালিন্দীতীরের প্রেম-প্রণয়-বিধুর গাথা। ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনার রচিত মহাভারতে আপনি কি তত্ত্ব প্রতিপাদিত করেছেন—ব্যাসদেব উত্তর দিয়েছিলেন

যত্তু সর্বগতং বস্তু তদ্বৈব প্রতিপাদিতম
বিশ্বভরণ পোষণ কর জোই তাকর নাম ভারত-অস হো।

কাশীতে এলে এই কথাই মনে পড়ে—অতীতের মৃগদাবপত্তন থেকে আজকের নাগোয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় সেই শুদ্ধ ইতিহাসের অখণ্ড ধারারই এক একটি স্ফুরণ—জাতকে কত কাশীরাজের গল্প পড়ি আমরা—কেউ অত্যাচারী কলাবু, কেউ ছদ্মবেশী বোধিসত্ত্ব, কেউ গর্বিত ব্রাহ্মণ শিষ্য শ্বেতকেতুর গুরু যিনি চণ্ডালবংশের গৌরবে হীন মনে করতেন, কার রাণীর নাম চন্দ্রমুখী পুত্রের নাম চন্দ্রকুমার। আবার এখানেই ত্রিজনেশ্বরী, ত্রিলঙ্গী জ্ঞানোদয়করী কাশীপুরাধিশ্বরী মাতা সৌভাগ্য মহেশ্বরী বাস করেন,—যাঁকে আমরা নিত্য বলি—ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ইতিহাস একে ছুঁয়ে গেছে হাজার হাজার বছর ধরে—উপনিষদের প্রান্ত সীমা থেকে বৌদ্ধ জৈন গুপ্ত প্রতীহার পালদের সামনে রেখে, মুসলমান যুগ পেরিয়ে ভগ্ন মন্দির পিছনে ফেলে চৈতসিংকে হাঁকিয়ে

দিয়ে ইংরাজ যুগ পর্যন্ত। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়কার একটি গল্প মনে পড়ছে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের ভারত-ত্যাগের পর যখন বাগ্মিবর বার্ক, শেরিডান্ প্রভৃতি মনীষিগণ ইংলণ্ডে তাঁর ভারতশাসন সম্বন্ধে নানা অপ্রীতিকর সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর গুণমুগ্ধ বহু ব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এবং কেহ কেহ হেস্টিংসের অনুরাগী বন্ধুদের বা অধস্তন রাজপুরুষদের উৎসাহে ও অনুরোধে তাঁর সুশাসন, কর্মকুশলতা ন্যায়ানুরাগ, শৌর্যবীর্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ইত্যাদি গুণাবলী কীর্তন করে তদানীন্তন গবর্নর-জেনারেল, ইংলণ্ডেশ্বর ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের কাছে পত্রাদি লেখেন। এইরূপ অনেকগুলি পত্রের সন্ধান দিয়েছেন সরকারী মহাফেজখানার তরফ থেকে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও মনীষী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত উমেশ মিশ্র তাঁদের সম্পাদিত গঙ্গানাথ ঝা গবেষণা-ভবন হইতে প্রকাশিত সংস্কৃতে লিখিত দলিল ও চিঠিপত্রাদির বিবরণীতে। এক কাশী হইতেই ঐরূপ চারখানি পত্র লেখা হয়েছিল। তন্মধ্যে একখানি পত্র কাশীর বাঙালী পণ্ডিতদের লিখিত বলে সরকারী দপ্তরে পরিচিত। (Bengali Pandits of Banaras on Warren Hastings. OR 31 July 1788 No. 434.)

এই পত্রখানির কিছু পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আর-একখানি পত্র মহারাষ্ট্রীয় ও নাগর ব্রাহ্মণদের দ্বারা লিখিত বলে কথিত। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, এইসব প্রশস্তিপত্রের মূল্য কি? সম্পাদকের মতে—

"The Pandits speak of the rare kindness which they received from Hastings during his second visit to Banaras. A sincere patron of oriental learning Hastings must have received his learned visitors with spontaneous courtesy which made a lasting impression on them. .. It may, therefore, be reasonably concluded that those two documents reflect the genuine feeling of the signatories though the idea of bearing public testimony to Warren Hastings's character and achievements must have emanated from men of rank and wealth."

যে পত্রখানির কথা বলা হল সে পত্রখানি সংস্কৃতে রচিত হলেও অষ্টাদশ

কিন্তু আশ্চর্য বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় দিল্লীর ছবি বাঁশরীর সর্ব শেষ সুরে আজও মেলায় নি। দিল্লী মরে নি। জীবনের মাল্য-হৃত-খসা প্রাণবীণায় তার অফুরন্ত সুরের ঝঙ্কার, কখনো দ্রুত, কখনো লয়ে বিলম্বিত, কখনো স্তিমিত, কখনো চাঞ্চল্যে ভরা তার বীজ অমর অঙ্কুরের সন্ধান পেয়েছে। ভোজবাজির সাহায্যে বারে বারে সে তার যৌবনকে নিয়েছে রাঙিয়ে, জীবনের জারকরসে দিয়েছে জারিয়ে। কালের চক্রান্তে মোহের বশে আমরা ভুলে যাই বিশ্বকবির সেই অতিপরিচিত কথা—দেশ মাটিতে তৈরি নয়—ভৌগোলিক সীমা পেরিয়ে আছে মানসলোকের মহিমা, মানুষে মানুষে মিলিয়েই দেশের চেহারা, মানুষের পরিচয়েই তার ইতিহাস। সেই ধারা অনাদ্যন্তবান, শুধু অতীত দিনের কাহিনী নয়, বর্তমানের পটভূমি, ভবিষ্যতের ভিত্তিভূমি। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়ে সেই মণিগণে সূত্রসন্ধানী। জনগণমন ঐতিহ্যবিলাসী হয়ে যুগে যুগে ধাবিত। ইতিহাসকার তার মধ্যে খুঁজেছেন প্যাটার্ন—নিয়ম যতি দ্বন্দ্ব ছন্দ চ্যালেঞ্জ রেসপন্স। স্তব্ধ মহাকালের উপর নৃত্যশীলা রূপাতীতা রূপমোহিনীর চরণচিহ্ন শুধু পড়ে যাচ্ছে!

এই সেই দিল্লী যে শুনেছে সামবেদের গান, ঋষিদের স্তব।

'মা নো মর্তা অভিদ্রুহন্ তনূনামিন্দ্র গির্বণঃ ঈশানো যবয়া বধং' মৃত্যুর শক্তি যেন আমাদের রূপায়ণের উপর না এসে পড়ে.....হে শক্তিমান, ব্যাহত কর সকল আক্রমণ। এইখানেই একদিন দেবশিল্পী ময়দানব ইন্দ্রজালের ইন্দ্রধনুচ্ছটায় ইন্দ্রপ্রস্থকে গড়ে তুলেছিল রূপে ও সৌন্দর্যে, স্ফটিকে বৈদূর্যে, হীরা-মুক্তামাণিক্যের ঘটায়। এরি বহিরঙ্গনের চারি পাশে একদিন সমবেত যুযুৎসবরা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিয়ে ভারতযুদ্ধে মেতেছিল, বীর দিয়েছিল প্রাণ, সতী হয়েছিল পতিহীন, মাতা পুত্রহীনা। গান্ধারীর আবেদন হয়েছিল বিফল। এরি মাঝে পাঞ্চজন্যের সাথে, গাণ্ডীবের টঙ্কারের সঙ্গে তিনি শুনিয়েছিলেন অমৃতকথা, দিয়েছিলেন চরম ও পরম আশ্বাস—বারে বারে আমি আসব, যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—সেই মানুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন অর্জুনকে, সত্যসন্ধ সব্যসাচীকে জানিয়েছিলেন অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা, অবিচলিত জ্ঞানের কথা, নিষ্কাম কর্মের কথা—তুমি হও নিমিত্ত মাত্র—সমর্পণ করো নিজেকে।

এইখানে অশোকের বাণী আজও উৎকীর্ণ। তথাগতের করুণা ও মৈত্রীর পতাকা হস্তে যিনি ধর্মবিজয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁর অনুগামীদের—সর্বসম্প্রদায়ের স্বার্থই ছিল যাঁর স্বার্থ, পঞ্চশীলে যিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত।

এই দিল্লীই দেখেছে হূণ-শক-কুশানদের, গুপ্তদের, মৌখরীদের, বর্ধনদের, চৌহানদের। 'দিল্লী চলো', 'দিল্লী চলো' তাই আজকের কথা নয়—যুগ যুগ ধরে ভারতের ইতিহাসে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে—কবিরা গেয়েছে গান, কর্মীরা তুলেছে তান, লোকেরা ছুটেছে—দিল্লী বহুত্‌ দূর। তুষারশীর্ষ হিমগিরি অধিত্যকা পেরিয়ে, তরঙ্গচুম্বিতা সাগর লঙ্ঘন করে এসেছে বণিক সৈনিক রাজাপ্রজা আমীর ওমরাহ সুলতান বেগম-বাঁদীর দল—ইরান তুরান হতে, মহাচীন হতে, আরব তুর্কিস্থান হতে, সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে, মরুভূমি অতিক্রম করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দিল্লী শুনেছে কত বুকফাটা কান্না, কত অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, হস্তীর বৃংহতি, তরবারির ঝন্‌ঝন্‌, কামানের গর্জন, শকুনির উল্লাস, আর্তের চীৎকার, ঐশ্বর্যের মদমত্ত দৃপ্ত পদক্ষেপ, তবু দিল্লী মরে নি। আবার শুনেছে যমুনার ধারে কলতানের সহিত বেদধ্বনি, মন্ত্রের উচ্চারণ, মুয়েজ্জীনের কণ্ঠে আল্লাহুর জয়গান, পণ্ডিতের বিচার, জ্ঞানীর আলাপ, রসিকের রসচর্চা, কবির বয়েৎ, উৎকণ্ঠিতা নায়িকার মৃদু ভাষণ। কত ষড়যন্ত্র বিপ্লববিদ্রোহের গুপ্ত প্লাবনে প্রাসাদে প্রাসাদে নেমেছে সন্ধ্যা, আজকের বাদশাহ্‌ হয়েছেন কালকের ফকীর, কত রাজপুত্রী বিরহ আগুনে পুড়েছেন, কত বাঁদীর কামনার পিছল স্রোতে ডুবে গেছে কত শাহ্‌জাদা, মনসব্‌দার, সুবেদার। তবু এত বাহ্‌...এও দিল্লী বটে কিন্তু দিল্লীর সব নয়। তার অমর আত্মা শুধু তৃষিত চাতকই নয়, নৈঃশব্দেও ডুব দিয়েছে বারে বারে। তার দৃষ্টি চলে গেছে সৃষ্টিলোকে, দূরলোকে, মরতার দুর্গ ভেদ করে অমরতার দুর্গেশনন্দিনীর দিকে। বেদব্যাস বৈশম্পায়ন সৌতিসনকের দিন হতে রাজসূয় অশ্বমেধ সভাপর্ব উদ্যোগ পর্ব সে দেখেছে, শুনেছে মীয়া কী মল্লহার দরবারী কানাড়া, আমির খসরুর তান, গালিবের গান। আজও জুম্মা মসজিদের ছায়ায়, কুদসিয়া উদ্যানের পাশে, রিজের ধারে দিল্লীবাসী আঁকছে পুঁথি, নক্সা করছে, সূক্ষ্ম শিল্পের জরীর কাজ চালাচ্ছে।

তাই দিল্লীর গল্প শুধু আজকের দিল্লীর কথা নয়, কালকের দিল্লীর কাহিনী নয়—নয়া-দিল্লী ও পুরানো দিল্লী নিয়েই তার যাত্রার সীমা সমে এসে থামে নি। পুরানো দিল্লীর কঙ্কালের নীচে ইন্দ্রপ্রস্থের যে 'অস্থি' পাওয়া গেছে সে যে দধীচির হাড়। তা থেকে আজকের 'আনক্লেভ ডিপ্লোমাটিকে' ইতিহাসের পারম্পর্যে বহু যুগের ওপারে হলেও কালসমুদ্রের পুরোগামিনী গতিতে একই অবিচ্ছিন্ন ধারায় স্তব্ধ। রায়পিথোরার লাল কিল্লা কুতব ও ইন্দ্রপথ,

ফিরোজাবাদ ও কোটলা, তুঘলকাবাদ ও সুরযকুণ্ড, সাহাজানাবাদ ও টিমারপুর, বিনয়নগর ও মাননগর দিল্লীর বহু যুগের বহুমুখী প্রকাশ। আজ অতিথিদের অতিকায় মোটরগুলি বিজ্ঞানভবন উদ্যোগভবন থেকে চলে যায় নীতিমার্গ, ন্যায়মার্গের পথ বেয়ে পঞ্চশীলের মসৃণ রাস্তার উপর দিয়ে অশোক হোটেলে।

তাই বলি দিল্লীর কথা ও কাহিনী সব যুগের, সব লোকের, সব সময়ের। এ শুধু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ের কথা নয়, অনঙ্গপাল বা তোমরদের গল্প নয়, পৃথ্বীরাজ চৌহান বা সংযুক্তার কাহিনী নয়। এরি দেহলীতে যোগিনীপুর মিশেছে, মিহিরপুর বেঁচে আছে মেহেরৌলিতে। এইখানেই মিলিয়ে গেছে চেঙ্গিস তৈমুর ঘোরীর দল, তুঘলক খিলজী লোদি সৈয়দরা। কিন্তু মিলিয়ে যায় নি কুতুবশাহী মিনার, ইলতুতুমিস্, রাজিয়ার স্বপ্ন। কান পেতে শুনলে আজও শুনতে পাওয়া যেতে পারে 'হোরি হ্যায়', 'ফাগুন মে হোরি মচাও'। হয়তো দিল্লীর হাওয়ায় আজও ভেসে বেড়ায় আলাউদ্দীন পদ্মিনীর কথা, লাজহরণ জহরব্রতের গল্প, বৈজুবাওরার তান্, সেলীম চিস্তির আশীর্বাদ। তখত্ তাউস, ইমারৎ জহরৎ রাজ্য-সাম্রাজ্যের লোভে রক্তের ফোয়ারা বয়েছে এইখানে সত্য, এসেছেন বাবর ব্যাঘ্রঝম্পনে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী শুনেছে গহরসাদের কবিতা, মীর সৈয়দ আলীর তুলির স্বপ্ন, নিজামীর কাব্য, সাদির গুলিস্তান। এইখানেই লেগেছিল শেরশাহে হুমায়ুনে দ্বন্দ্ব, কিন্তু দেখি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে বেরুল মস্ত বড় রাস্তা। আবুল-ফজল তোডরমল বদৌনীর কাহিনীতে আগ্রা ফতেপুরসিক্রীর পাশে দিল্লীরও প্রাণস্পন্দন পাই, জগজ্জ্যোতি সম্রাটের ইবাদতখানার দীন ইলাহির কথা শুনি। সন্ত নিজামুদ্দিনের সমাধির ধারে দীন আচ্ছাদনে দেখেছি জাহানারার কবর—একটুকরো ঘাসের মাঝে সবুজ হিল্লোলে দোলে প্রাণের প্রকাশ।

বেগায়র সবজা না পোশাদ কসে মাজারে মারা
কে কবর পোবে গরিবান হামিন গিয়াহ বস্ত।

একমাত্র ঘাস ছাড়া আর-কিছু যেন না থাকে আমার সমাধির উপরে। আমার মত অভাজনের সেই শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন। এইখানেই রূপকুমারীরা হোরী খেলেছে, রাজপুতানী রাখীবন্ধ ভায়ের কাছে রাখী পাঠিয়েছে, কেশবতীর কেশের আড়ালে বিদ্যুৎ চমকেছে, নকীব হেঁকেছে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, স্তব্ধ নহবতে গভীর রাতে হঠাৎ বিলম্বিত তালে দ্রুত বেহাগ উঠেছে, বিরহী রামকেলির ঠাট্ কামকলার ইন্ধন জুগিয়েছে। সাধু দরবেশ অভিশাপ দিয়েছিলেন—দিল্লী হনোজ দূর অস্ত। দারা শিকোহ্র দার্শনিকতা, এইখানেই

পেয়েছিল তার বিকাশ—নবী আলমগীরের দারুল-ইসলামের মাঝে পেয়েছিল সমাধি। যে আলমগীর পিতা সাজাহানকে বলেছিলেন—

কর্দা এ খেশ, আয়েদ পেশ
জিয়াদা-হদ্দ-ইআদব

যেমন কর্ম তেমনি ফল, বেশী লেখা বেয়াদবী। হতভাগ্য পিতা শুধু বলেছিলেন যে, আগ্রা দুর্গের জল সরবরাহ ব্যবস্থাটা নষ্ট করে দিয়ো না।

বাবা-ই-মন্, বাহাদুর-ই-মন্
দিরোজ সাহিব ই নওলাখ
সওয়ার বুদেম
ইমরোজ বা এক আরদার মুহতাজ।
আফ্রিন্ বর হিন্দ দর হরবার
মুর্দা মে দায়েম জানেম আব্
আ পেসর তু আজল মুসলমান-ই
জিন্দা জানেম আব্ না র সানি।

বাবা আমার, বীর আমার,
কাল আমি ন' লাখ সওয়ারের অধীশ্বর ছিলাম
আজ আমার একজন জল দিবার ভৃত্যেরও অভাব।

হিন্দুদের তারিফ করি
তারা মৃতকেও জলদান করে
হে আমার পুত্র তুমি অদ্ভুত মুসলমান
জীবিত পিতাকেও তুমি জলদানে
বঞ্চিত করেছ।

দিল্লীর রাজপথে সেদিন এই পিতার আরেক পুত্রই হেঁটমুখে ঘোড়ার দিকে পিছনে ফিরে অপমানিত হয়ে বাহিত হয়েছিলেন সে কথা কি দিল্লীর সুষুপ্ত আত্মা আজও স্মরণ করে! ভুল করে বলেছিলেন সম্রাট—মর্ত্যের বেহেস্ত আছে এইখানে, ভুলেছিলেন স্বর্গ জন্ম নেয় মাটিমায়ের কোলে, রাজার বিলাসভবনে নয়। তার কিছুদিন পরেই যখন দিল্লীর প্রাসাদকূটে কাথতাই মুঘলদের নাভিশ্বাস ঘনিয়ে এল, তখন মর্মরের মরা মিছিলের ময়ূর সিংহাসনে বসে, দিনান্তের তিমির নিবিড় সন্ধ্যায় সনাতন দিল্লীর আসল অধীশ্বর কী আসন্ন পটপরিবর্তনের কথাই ভেবে হাসছিলেন! মহম্মদ শাহ্ রঙ্গিলা তখন গজল ও নৃত্যে মেতে আছেন। নাচের আসরে ব্যর্থ ঝঙ্কারে লালসা বিলসিত

"স্বয়ম্ভু যত্র হুত ভুগ ভুবো গর্ভাৎ সমুন্নিষ্ঠন্।
জুহ্বতাং প্রতিগৃহ্ণাতি জ্বালাভুজবনৈর্হবি ॥"

অগ্নি ভূগর্ভ হতে স্বতঃপ্রজ্বলিত হয়ে শিখাহস্তে এখানে হোতৃপ্রদত্ত হবি গ্রহণ করেন।

"অসন্তাপসহতাং জানন্ যত্র পিতা বিনির্মতে।
গৌরবাদিব তিগ্মাংশুর্ধত্তে গ্রীষ্মহপ্যতীব্রতাম্ ॥"

এই কাশ্মীর পিতা কাশ্যপের নির্মিত ও সন্তাপসহনে অক্ষম জেনেই সূর্যদেব গৌরবপ্রকাশে গ্রীষ্মকালেও কম সন্তাপ দেন।

"বিদ্যাং বেশ্মানি তুঙ্গানি কুঙ্কুমং সহিমং পয়ঃ।
দ্রাক্ষেতি যত্র সামান্যমস্তি ত্রিদিবদুর্লভং ॥"

কুঙ্কুম, অতি শীতল জল, বিদ্যা, উচ্চহর্ম্য, দ্রাক্ষাফল সাধারণের কাছে সুলভ বলেই কাশ্মীর ত্রিদিবে দুর্লভ।

কাব্যে কাশ্মীরের কথা বলতে গেলে প্রথমেই কলহনের এইরকম শত শত শ্লোক মনে পড়ে—কত রম্যবর্ণনা, কত সরস চিত্র, কত চরিত্রের নিপুণ আলেখ্য, ইতিহাসের কত মনোরম কাহিনী। তিনি ছিলেন কাশ্মীরের প্রধান অমাত্য চম্পকপ্রভুর পুত্র। তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী' শুধু কথা ও কাহিনীর লেখমালা নয়, রসোজ্জ্বল স্নিগ্ধ সাহিত্যও বটে। ইনি প্রায় আট শো বছর পূর্বের লোক, এবং এতে কুরুপাণ্ডবের সমকালবর্তী গোনর্দ থেকে তৎকালীন রাজা জয়সিংহের কাল পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে সুললিত ছন্দে, অপরূপ ভাষাবিন্যাসের মধ্য দিয়ে। কলহনের পূর্বে কবি সুব্রত, ক্ষেমেন্দ্র ও হেলারাজের নাম শুনি। ক্ষেমেন্দ্রের 'নৃপাবলী' ও হেলারাজের 'পার্থিবাবলী' সমধিক প্রসিদ্ধ। কলহন নিজেই বলেছেন যে পূর্ব পণ্ডিতদের কৃত এগারোখানি পুস্তক, নীলমুনির মত, প্রতিষ্ঠা, শাসন ও প্রশস্তিপট্ট দর্শনে এই পুস্তক অর্থাৎ 'রাজতরঙ্গিণী' তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শ্রীকান্ত রাজ বিপুলাভিজনাব্ধিমধ্যং বিশ্রান্তয়ে বিশতি-রাজতরঙ্গিণীয়ম্। কলহনের পরেও জোনরাজ, শ্রীবর ও শুক কাশ্মীর কাহিনীকে মুঘল যুগ পর্যন্ত টেনে এনেছেন।

ঋষি কবির দিব্য অনুভূতিতে ইতিহাসের যে পরম সত্য প্রতিভাত হয়েছিল,

"দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে"

কাশ্মীরেও তা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। কাশ্মীরে নানা সংস্কৃতির, নানা ধর্মের, নানা জাতির মিলন হয়েছে। তাই তার জীবনে এসেছিল বিচিত্রতার সমন্বয়,

তাই কাশ্মীরের সম্পর্কিত সাহিত্যে শুধু নিসর্গের বৈচিত্র্যই ফুটে ওঠে নি, ফুটেছে যারা এসেছিল 'রণধারা বাহি জয় গান গাহি, উন্মাদ কলরবে', যারা এসেছিল "ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত' তাদের কথাও। গ্রীক শক য়ুয়েচী কুষাণ হুন, আরব তাতার মুঘলের সঙ্গে মিশে গেছে গৌড় কামরূপ উত্তরপ্রদেশ হিমাচল দেশের লোকেরা, নিষাদেরা ডামরেরা। কাশ্মীরের ইতিহাসে আমরা পড়ি অশোক হুস্ক জুস্ক কনিষ্ক হর্ষ মিহিরকুলের নাম। নাগার্জুন কোণ্ডার প্রস্তরলিপিতে দেখি কাশ্মীরে সদ্ধর্মীদের অভ্যুদয়ের কথা। পণ্ডিতদের মতে কাশ্মীরের ভাষাও মিশ্র ভাষা—সংস্কৃত সাহিত্যে যাকে বলা হয় পৈশাচী বা দর্দি। কিন্তু কাশ্মীরে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে তা বেশীর ভাগই সংস্কৃত সাহিত্য আর বৌদ্ধ সাহিত্যের কিছুটা প্রাকৃত ভাষায়।

কাশ্মীর নাম নিয়েও নানা কিংবদন্তী, নানা মত প্রচলিত আছে। কাশ্যমীর, কশীর মীর (মীর অর্থাৎ পাহাড় বা মঠ), কেশবীর ইত্যাদি Phonetic vagaryর নানা উদাহরণ পাওয়া যায়। টলেমীর ভূগোলেও (১৫০ খ্রীঃ অব্দ) Kaspeiria নামে সিন্ধু উপত্যকা ও বিতস্তা তীরে একটি দেশের সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে কুলিন্দের দেশও বলা হত। মনে হয় হিমালয়ের এক বহুবিস্তৃত ভূভাগেরই নামে ছিল কাশ্মীর। মহাচীনের বহু আখ্যানেও আমরা কাশ্মীরকে পেয়েছি। সুবিখ্যাত ট্যাং-সম্রাটদের সময় চীনে ভারতের দূত যায় (৫৪১ খ্রীঃ অব্দ)। সে দিনের বর্ণনায় কাশ্মীরের নাম না থাকলেও এই কথা আছে—

"At the foot of the snowy mountains and enveloped by them on all sides like a precious jewel in the south there is a valley which leads up to it and serves as the gate of the kingdom."

এর পরে সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং কাশ্মীরে দু বছর কাটিয়ে এক মনোরম ইতিহাস, ধর্ম ও সাহিত্যের বিন্যাসকে কাহিনীতে সাজিয়ে দিয়ে অমর করে রেখে গেছেন। তিনি বিতস্তা-উপত্যকার মধ্য দিয়ে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। বরাহমূল (Baramula)-দ্বারের তিনি উল্লেখ করেছেন, হুবিষ্কপুরের বর্ণনা করেছেন। শ্রীনগরে গিয়ে তিনি "জয়েন্দ্রবিহারে" অবস্থান করেন। হিউয়েন সাংয়ের কাহিনীতে কাশ্মীরের বহু তথ্য পাওয়া যায়। ওই কাহিনীর সাহিত্যিক মূল্য কতটা আছে সেটা তর্কের বিষয় হলেও এ কথা বলা যায় যে, ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের ইতিহাসে এই চৈনিক পরিব্রাজকের কাহিনী এক পরম সম্পদ বলেই স্বীকৃত হয়েছে—

যাহা পায় তার সাথে যাহা নাহি পায়
তাহারে মিলায়,
উপমা তুলনা যত ভিড় করে আসে
ছন্দের কেন্দ্রের চারিপাশে।"

নরনারীর আদিরসকে আশ্রয় করে শৃঙ্গারবিলাসের বর্ণনা শুধু কাশ্মীর সাহিত্যে নয়, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রীতিতে অপরিচিত ছিল না। কালিদাসের মত কবি কুমারসম্ভবের মত কাব্যেও এর লোভ সামলাতে পারেন নি। তবু এ কথা স্বীকার্য যে কুমারসম্ভবের কবি আশ্চর্য রকম সংযম দেখিয়েছেন সেইখানে যেখানে ধ্যানস্থ মহাদেব 'আত্মানম্ আত্মনি অবলোকয়ন' 'অন্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞম্ পরং জ্যোতি দৃষ্টা' বীরাসন শিথিল করে নেত্র উন্মীলন করলেন, ও দেখলেন সামনে আসছেন পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব বিশীর্ণক্রমা উমা। যোগীশ্বরেরও মন সামান্য চঞ্চল হয়েছিল, কিন্তু তার ফল হল এই, কাম ভস্মীভূত হয়ে গেল বিশুদ্ধ প্রেমের পাবক পাবনে। চক্রীকৃত চারুচাপ ব্যর্থ হল। আদিরসের পিছনে এলেন আদিমতম যিনি। কাব্যের সার্থকতা এইখানে। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকেও এই সত্যের স্থচনা দেখি। অভিজ্ঞান-শকুন্তলায়, কুমারসম্ভবে, এমনকি রঘুবংশেও এই সত্য প্রতিভাত। বিক্রমোর্বশীর কথা বলছি, কারণ অনেকের মতে বিক্রমোর্বশী নাটকের ঘটনাস্থলের প্রথম ও প্রধান অংশই হিমালয়ে, এবং সম্ভবতঃ কাশ্মীরে।

উর্বশীকে নিয়ে যুগে যুগে কবিরা কাব্য লিখেছেন। ঋক্‌যুগে বৈদিক কবি তাকে মঘোনী রিতাবরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শতপথব্রাহ্মণে আর-এক উর্বশীর দেখা পেয়েছি। কালিদাস রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ সবাই করেছেন উর্বশীবন্দনা। কালিদাস উর্বশীকে চিত্রিত করেছেন প্রেমময়ী পরমাসুন্দরী মনোহারিণীরূপে। তার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের কথায় দ্যুলোকের আবহাওয়া আছে, সুদূরের জ্যোতি আছে, অবাধ বাতাসের মুক্ত নিশ্বাস আছে, কিন্তু সেগুলো তার সত্তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। সে সখী, সে সহোদরা, সে প্রিয়া, সে জায়া, সে জননী। সে স্বর্গের কামনাকেন্দ্রের নেত্রী নয়, সে অপ্সরা নয়, 'অনপ্সরেব মে প্রতিভাসি'—সে মানুষী, সে প্রেমিকা, দুর্বৃত্ত হরণ করলে সে মূর্ছা যায়, সে বলে—'সখি মা খলু মা বিস্মর'—আমাকে ভুলে যেয়ো না; সবচেয়ে বড় কথা, সে মা—

"পুত্তও মে আউ? মহস্তো কৃখু সংবুত্তো
অয়ং মে পুত্রক আয়ু, মহান্ খলু সংবৃত্ত…

ইয়ং তে জননী প্রাপ্তা ত্বদালোকানাতৎপরা,
স্নেহ প্রস্রবিনীভিন্নমুদ্বহন্তী স্তনাংশুকম্।"

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ফুটে উঠেছিল আর-এক উর্বশী যে বিশ্বের প্রেয়সী, যে কন্যা নয় বধূ নয় মাতা নয়। ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা যার চরণশোণিমা, সে কুণ্ঠিতা প্রেমিকা নয়, যে স্তব্ধ অর্ধরাত্রে পুরুরবার সলজ্জ বাসরসজ্জাতে প্রেমের দীপালি জ্বেলে দেবে। উর্বশী সূর্যালোকের দীপ্তির মত, উষার রক্তিম আভার মত, সমুদ্রের কলকণ্ঠের মত, বিদ্যুৎচমকের মত, অর্থাৎ এককথায় বিশ্বে যা কিছু উজ্জ্বল সুদূর অলভ্য ও মোহনীয় সে তাই। মর্ত্যরূপে, মর্ত্যজীবনে, মানুষের বাসনা ও আবেগের আনন্দে যা কিছু অপূর্ব সুন্দর ও মুগ্ধকর সে তাই।

তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্যের অনেক কিছুই কাশ্মীর হতে সংগৃহীত। তিব্বতী চিত্রকলার (Scroll painting, Banner painting) প্রচলন কাশ্মীরেও কিছু পাওয়া যায়। কাঞ্জুর হচ্ছে বুদ্ধবচন আর তাঞ্জুর হচ্ছে শাস্ত্র। এই কাঞ্জুরের বিনয় মূল সর্বাস্তিবাদের বিনয়—এর উদ্ভব কাশ্মীরে, প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রমুখ পণ্ডিতদের তাই মত। সর্বজ্ঞমিত্রের স্রগ্ধরা স্তোত্র যেন হিমালয়, বিশেষ করে কাশ্মীর-কন্যাদের নিয়েই লিখিত।

"হারাক্রান্তাস্তনাস্তাঃ শ্রবণকুবলয় স্পর্ধমানায়তাক্ষ্যো।
মন্দারোদার বেণী তরুণ পরিমলামোদমাত্তম্ দ্বিরেফাঃ॥
কাঞ্চীনাদানুবন্ধোদ্ধততর·চরণোদারমঞ্জীর তূর্যা।
স্তন্নাথান প্রার্থয়ন্তে স্মরমুদিতাঃ সাদরা দেবকন্যাঃ॥"

দেবকন্যারা তোমাকে স্বামীরূপে সাদরে আকাঙ্ক্ষা করছেন। মন্মথের পীড়ার জন্য হর্ষে তাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। গলার হার এসে বক্ষের উপরে পড়েছে, তাঁদের আয়তলোচন শ্রবণকুবলয়কে হার মানিয়েছে। তাঁদের বেণীতে মন্দার ফুল, তার গন্ধে ভ্রমর আকুল, তাঁদের পায়ের নূপুরধ্বনি কাঞ্চীর ধ্বনিকে ডুবিয়ে দিয়েছে। জয়দেবের কাব্যে যে গান্ধর্বরীতির কথা পড়ি, তা কাশ্মীরেরই। সঙ্গীতরত্নাকরের শার্ঙ্গদেবের পিতামহ কাশ্মীর থেকেই দাক্ষিণাত্যে যান। বুলার সাহেব কাশ্মীরে এক গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি পান। তাতে লক্ষ্মণসেনের নাম আছে। গীতগোবিন্দে কাশ্মীর কথা পাওয়া যায়, কুঙ্কুমের দ্যোতক হিসাবে। টীকাকার বলছেন 'পদ্মাপয়োধর তটী পরিরম্ভলগ্ন' যে কাশ্মীর, তা প্রিয়ার অনুরাগই বহন করে আনে। গৌড়ের সঙ্গে কাশ্মীরের সম্পর্ক বহুদিনের। কল্হন নিজেই পরিহাস-কেশবের মন্দিরে বাঙালী বীরত্বের এক অপূর্ব গাথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। গৌড় জয় করে গৌড়েশ্বরকে বন্দী

কথা, পিতাপুত্র দলপৎরাম, নানালালের নানা গল্প, নভলরাম নারমাদের কাহিনী, গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠীর 'সরস্বতীচন্দ্র'। তাঁর কুসুম, তাঁর কুমুদ, তাঁর অলককিশোরী, গুণসুন্দরী, চন্দ্রাবতী আমাদের মুগ্ধ করবে। পড়ব আনন্দ-শঙ্কর ধ্রুবের, মহাদেব দেশাইএর, কানাইয়ালাল মুন্সীর, কাকাসাহেব কালেলকারের লেখা। তারপর একদিন নিভৃতে একান্তে বসে সমাহিতচিত্তে শুনব মহাত্মাজীর কথা—সেই দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস, হিন্দ-স্বরাজ, আত্মকথা। ফুটে উঠবে বরদৌলী আর সরদারের বাণী—সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে, আকাশে ফুটে উঠবে দুটি একটি তারা—শঙ্খ-ঘণ্টামুখর মন্দিরে মন্দিরে গিরিধার নাগরের জন্য মীরার ব্যথা ভাষা ছাপিয়ে ভাবের তরঙ্গে বেরিয়ে আসবে, কবি ভালন গাইবেন গান আর সন্ত কবি নরসিংদাস মেহেতা। আকাশ-বাতাসে বাজবে অমেয় স্বরে—বৈষ্ণব জনতো—আমরা শুধু নমস্কার জানিয়ে বলে আসব—হে দ্বারকাধীশ, জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস।

॥ পঁচিশ

হেমন্তের দিনান্ত বেলায় গৈরিকের ছোপ লেগে আকাশকে করেছে সন্ন্যাসী—যেন কোন উদাসী তার একতারাটি নিয়ে বৈরাগীর সুর ধরেছে দিগন্তের একটি নীরব নিভৃত প্রান্তে। আশ্রম পেরিয়ে মহাত্মাজী চলেছেন তাঁর বৈকালিক পরিক্রমায়—পায়ের প্রতিটি পদক্ষেপে 'মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চ' লাগছে। কিন্তু সেই 'সৌম্য সহাস বিকচ-নয়ান' সে দিন যেন একটু চিন্তাম্লান। সারা ভারতবর্ষ যাঁর তপস্যায় 'উথল হো গিয়া', যিনি শিবের মত বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়ে মন্বোভব মন্বন্তরের কল্যাণ-বাণী গঠনকার্যে নিয়োগ করেছেন, যিনি গীতার 'অনপেক্ষ শুচিদক্ষ' তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী অনিকেত স্থিরমতির প্রায়, তাঁর ললাটের জটিল জটাজালে চিন্তার দুর্মোচন রেখা কেন? অবশ্য দেশের কত শত সমস্যা রয়েছে, কত বাধা, কত বিপদ, কত ন্যায় অন্যায়ের বিচার, বাদ-বিতণ্ডা। আবার ওদিকে পশ্চিমী সাগর-তীরে দিকে দিকে দ্বিতীয় বিশ্বতাণ্ডব চলেছে, তার বাত্যাবিক্ষুব্ধ প্রচণ্ড ক্ষোভ আস্ফালন করছে পূর্বাচলে। ভারতবর্ষের সম্মতির অপেক্ষা না

রেখেই, তার রাষ্ট্রনায়ক চিন্তানায়কদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত বলে ঘোষণা করেছেন ইংরাজরাজ। গান্ধীজীর সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক হচ্ছে নেতাদের। কিন্তু সেদিন সেই স্তব্ধ সন্ধ্যায় গান্ধীজী শুধু ভাবছিলেন বড় বড় সমস্যার কথা নয়, একটি অতি হীনদীন কুষ্ঠরোগীর কথা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত যে, কুষ্ঠ সেবা গান্ধীজী পরিকল্পিত গঠন কর্ম-স্থচীর অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ১৩-১১-৪৫ সালে পুণা থেকে মহাত্মাজী বলেছিলেন, 'যদি ভারতে নূতন জীবনের স্পন্দন থাকিত, যদি আমরা প্রকৃতই সত্য ও অহিংসার পথে অবিলম্বে স্বরাজ অর্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হইতাম, তাহা হইলে যাহার খোঁজ লওয়া হয় নাই বা যাহার সেবার ব্যবস্থা করা হয় নাই এমন একটি ভিক্ষুক বা কুষ্ঠ রোগীও ভারতবর্ষে থাকিত না।" (হরিজন পত্রিকা, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১)।

যেতে যেতে তিনি থমকে দাঁড়ালেন—কে একজন খঞ্জ আতুর এগিয়ে আসছে—একটি পুঁটলি হাতে—দূর থেকেই সে প্রণাম জানালে মহামানবকে।

গান্ধীজী একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন,—তুমি কি আমার চিঠির উত্তরের অপেক্ষা করতে পারলে না, শাস্ত্রী?

মাথা নীচু করে রইল লোকটি। যারবাদা জেলে শাস্ত্রীর সঙ্গে মহাত্মাজীর পরিচয়। সে ছিল স্বভাব কবি, সংস্কৃতে কাব্য রচনা করত মুখে মুখে—পণ্ডিত লোক। জেলে ও জেলের বাহিরে, অত্যাচারে, অভাবে, অনশনে, দুঃশাসনের পেষণে করাল কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। স্বজনহীন, বান্ধবহীন, নিরাশ্রয়, নিরালম্ব। রোগের মহিমা এমনি যে পরমাত্মীয়ও অনাত্মীয় হয়, পথচারী পথিক শিউরে ওঠে, সবাই মনে করে জন্মান্তরের কোন দুরন্ত অভিশাপে এই অমঙ্গলের সূচনা। তবু শাস্ত্রীর আশার শেষ ছিল না। জানত সবাই দূরে ঠেললেও মহাত্মাজী ঠেলবেন না। দূর অতীতের জেলের স্মৃতির আবরণ উন্মোচন করে সে চিঠি লিখলে মহাত্মাজীকে—আমার এই কলঙ্কিত বিড়ম্বিত কুণ্ঠিত জীবনের একটি শেষ আকাঙ্ক্ষা যে আপনার সঙ্গে আশ্রমে কয়েকটা দিন কাটাব।

অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই মনের আগ্রহে সে রিক্তহস্তে বেরিয়ে পড়েছিল পথে, তীর্থযাত্রীর মত। দেবদর্শনে আবার অনুমতি কি?

মহাত্মাজী একটু কঠিন হয়ে বললেন—আশ্রমের অন্য অধিবাসীরা আছেন, শিশুরা আছে, মায়েরা আছেন, কুষ্ঠরোগ অত্যন্ত বিশ্রী সংক্রামক রোগ, একজনের জন্য আমি দশজনকে বিপদগ্রস্ত করতে পারি কি?

॥ ছাব্বিশ

ছোট্ট একটি মানুষ, কটিবস্ত্রসার, উত্তরীয় গায়ে, চোখে তাঁর অনাগত দিনের স্বপ্ন, মুখে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা, বুদ্ধ অশোকের বাণী তাঁর কণ্ঠে, দণ্ড হস্তে চলেছেন দৃপ্ত পদক্ষেপে, শুচি অনপেক্ষ শ্রেয়ের সন্ধানে। তাঁর পাদস্পর্শে যেন এক-একটি স্বয়ংস্ফুট পদ্ম ফুটে উঠছে যাত্রার পথে পথে, বলছে—শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ —সিদ্ধি যে করায়ত্ত, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত-ভাবনাহীন। মহাপুরুষের এমন একটা ছবি আমরা দেখেছি এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রেখায়, বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণ, রসায়নে রঙীন। এই লোকোত্তর মানুষটির সংস্পর্শে সারা ভারতবর্ষ বারে বারে উথলে উঠেছিল। রুষ্ট রাজশক্তিকে, বণিকের মানদণ্ডকে বলেছিল—তোমার সঙ্গে আমার প্রাণের, প্রেমের সহযোগ নেই, তোমার তৈয়ারী কানুন আমরা মানি না, তফাত যাও, হঠো, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। আবার একদিন অস্ত-মেঘের ছায়ায় যমুনার তীরে, কালিন্দীর কূলে সেই পায়ে-চলার শেষ হল—লক্ষ লক্ষ আর্তকণ্ঠে জবাব দিলে—না, না, শেষ হয় নি, গান্ধীজী অমর।

এই যে মানুষটি মৃত্যুহীন প্রাণ নিয়ে এসেছিলেন—সেই যে মহান আত্মা—আকাশ-বাতাস জুড়ে এই বিরাট দেশের শুদ্ধ অন্তরে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন বনস্পতির মত একাকী, অন্ত ত তার নেই, কিন্তু আদি। গঙ্গোত্রীর এক নিভৃত কন্দরে নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়, তারপর সে আলোর রাজ্যে আসে দুকূল প্লাবিয়ে, রুদ্ধ কারার বদ্ধ দুয়ার ভেঙে, ধরিত্রীকে শ্যামল করে। আমরা বাঙালী, ভাবি এই যে মানুষটি, এঁর আত্ম লীলায় বাংলার ও বাঙালীর সঙ্গে তাঁর কি পরিচয়। তাঁর আত্মজীবনীতেই সেই পর্বের অনেক কথা শুনি, অন্যত্রও ছড়িয়ে আছে। সেইগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে তাঁকে স্মরণ করি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যখন পশ্চিমের ঝঞ্ঝা এসে লাগল, তার ভালমন্দকে শিবের মত কণ্ঠস্থ করে নীলকণ্ঠ হয় বাঙালীই প্রথম। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে দেখি বাংলাদেশই ভারতবর্ষকে নতুন ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার শিল্পী, তার কবি, তার কর্মী, তার দেশনায়ক গড়ছে ভারতবর্ষের যজ্ঞ-সম্ভব মূর্তি, পূর্ণাহুতির সমিধ সংগ্রহ হচ্ছে। এই একশো বছরের ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি অপূর্ব। বাইরের দিকে চাইলে দেখা যায়, তার দৃষ্টি ফেরানো পশ্চিমের দিকে, প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন-ইতিহাস রাষ্ট্রবোধের দিকে।

তবু এই বাহ্য। তারই ভিতরে সে পশ্চিমের রসবস্তুকে আহরণ করে পূর্বের সূর্যকরোজ্জ্বল দীপ্তিতে রাঙিয়ে নিয়েছে। স্বয়ংপ্রভ আভায় বেরিয়েছে রামমোহনের ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্ম-সচেতন দৃষ্টি, দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধ, বঙ্কিমের মন্ত্র, মাইকেলের ছন্দ, ভূদেবের নিষ্ঠা, বিদ্যাসাগরের চরিত্র, রামকৃষ্ণের সাধনা, স্বামীজীর ধ্যান, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন। সেই যুগেরই ধারা বেয়ে ঋষি অরবিন্দ ছিলেন ধ্যান-মগ্ন।

সেই আত্মবোধের ফলেই স্বদেশী মেলার উদ্ভব, সেই স্বাদেশিকতার কবিই হেম, নবীন, রঙ্গলাল; বৃদ্ধ রাজনারায়ণ তার হোতা, জ্যোতিরিন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র তার তন্ত্রধারক। তারই পরিণতি কংগ্রেস—সর্বভারতীয় কল্পনার রাষ্ট্রিক বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশ তখন অগ্রসর, কলকাতা তখন রাষ্ট্রের কেন্দ্র। অবশ্য বাংলার যুবশক্তিই প্রথম লোকমান্য লাজপতের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের শেষ দশক—১৮৯৬ খৃঃ অঃ—পঙ্গোলা জাহাজ এসে কলকাতার বন্দরে ভিড়ল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত,—নামলেন একটি ছোট্ট মানুষ—ব্যারিষ্টার—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সেখানকার অপমানিত নির্যাতিত ভারতীয়দের তরফ থেকে দেশবাসীদের জানাবেন তাদের কথা, গঠন করবেন জনমত। প্রত্যেক ভারতবাসীকে সেখানে মাথাপিছু তিন পাউণ্ড করে কর দিতে হয়, সে কথা কি দেশবাসী জানে, সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের সামান্য সুখ-সুবিধাও নেই, সে কথা কি লোকে শোনে নি—কই প্রতিবাদ ত হয় না, কাগজে-কলমে, সভায়-সমিতিতে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের মধ্য দিয়ে জাহাজ আসে, তিনি অনুভব করেন যে, বাংলা সমুদ্র-মেখলা, শস্যশ্যামলা, নদীমালিনী, তার একটি কোমলে-মধুরে, বিশিষ্ট রূপ আছে, একটি বিশিষ্ট স্থান ও দান আছে ভারতের ঐতিহ্যে। কলকাতায় তিনি রইলেন না, চলে গেলেন নিজের কাথিয়াওয়াড় প্রদেশে, তারপর বোম্বাই, পুণা, মাদ্রাজ। বোম্বাই-এর স্যর ফিরোজ শাহ্ তাঁর পৃষ্ঠপোষক হলেন, মহা আড়ম্বরে বিরাট জনসভায় প্রতিবাদ হল। পুণায় গিয়ে তিনি দেখা করলেন লোকমান্যের সঙ্গে, গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের সঙ্গে। গান্ধীজীর আত্ম-জীবনীতেই আছে, ফিরোজ শাহ্‌কে দেখলে মনে হত তিনি যেন হিমালয়ের রজতধবল উন্নত শীর্ষ, দূর থেকেই দেখায় ভাল। লোকমান্য যেন বিরাট জলধি, গভীর অচঞ্চল আর গোখলে যেন পুণ্যা ভাগীরথী, মায়ের মতন সর্বদাই তপ্ত, ক্লিষ্ট জনকে আশ্রয় দেবার জন্য উৎসুক। মাদ্রাজ হয়ে গান্ধীজী

কলিকাতায় ফিরলেন, গণ্যমান্য কারো সঙ্গে পরিচয় নেই, হোটেলে ঘর নিয়ে আছেন। এইখানে তাঁর আলাপ হয় বিখ্যাত ডেলী টেলিগ্রাফের প্রতিনিধির সঙ্গে। বেঙ্গল ক্লাবে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন রিপোর্টার সাহেব—কিন্তু তখনও তিনি নেহাৎ আহেলা, সাগরপারের জনবুলের অতি প্রকট মূর্তি অনুধাবন করেন নি। জানতেন না যে, প্রকাশ্য ড্রয়িংরুমে কৃষ্ণ-চর্মাবৃত কালা আদমীকে নিয়ে যাওয়া অলিখিত আইন ভঙ্গের অপরাধ—ন ক্ষন্তব্যো ক্ষন্তব্য—সুতীব্র অক্ষমা সেদিন জমা ছিল তাঁর জন্য।

তখনকার দিনে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলাদেশের অবিসম্বাদী নেতা। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হল গান্ধীজীর, তিনি উপদেশ দিলেন—তাইত, দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা নিয়ে লোকে এখানে বিশেষ উৎসাহ পাবে বলে মনে হয় না, তা আপনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের রাজা প্যারীমোহন মুখুজ্যে ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্য নিন—

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'মুখুজ্যে বনাম বাড়ুয্যে'—দেশের প্রকৃত জননায়ক কে—এই নিয়ে তীব্র শ্লেষ। বাড়ুয্যে-মুখুজ্যে, রাজা-মহারাজা কারো কাছে সেদিন এ বিষয়ে গান্ধীজী বিশেষ সাহায্য পেয়েছেন বলে মনে হয় না। তার প্রধান কারণ এই নয় যে, বঙ্গ তার গঙ্গোদকে ভবিষ্যৎ মহাত্মাকে বরণ করে নি বা তার স্বরূপ চেনে নি—দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্ন বাংলার কাছে তখন গৌণই ছিল। এমন কি, তখনকার দিনের পত্রিকাগুলিও এ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। অমৃতবাজারের দপ্তরে, বঙ্গবাসীর বৈঠকখানায় ব্যস্ত সম্পাদক মহাশয়রা গান্ধীজীকে বলেছিলেন—স্থান নেই, দক্ষিণ আফ্রিকা বহুৎ দূর—দেশেরই সব অভাব-অভিযোগ নিয়ে আন্দোলন হয় না ত দক্ষিণ আফ্রিকার। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য করলেন স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, পাইওনীয়ার। ইংলিশম্যানের সম্পাদক সণ্ডার্স সাহেব গান্ধীজীকে লুফে নিলেন।

পট পরিবর্তন হল—১৯০১ সাল—কংগ্রেসের অধিবেশন হবে কলিকাতায়, সভাপতি দিন্‌শ ওয়াচা। গান্ধীজীর সেই প্রথম কংগ্রেসে যোগদান। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে গান্ধীজী প্রকাশ্য কংগ্রেসের সমর্থন চান। স্যার ফিরোজ শাহকে ধরলেন তিনি ট্রেনে তাঁর সেলুনে। স্যার ফিরোজ তখন বোম্বাইয়ের মুকুটবিহীন রাজা, বিরাট তাঁর মর্যাদা, অপর্যাপ্ত তাঁর ধনদৌলত প্রভাব প্রতিপত্তি। সেদিন গান্ধীজীকে তিনি একটি কথা বলেছিলেন—দেখ গান্ধী, নিজ বাসভূমে পরবাসী যারা, তাদের কী আর অন্যত্র সম্মান হয়—আমরা তোমার প্রস্তাব পাশ করব, কিন্তু স্বদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠ না হলে বিদেশে তার প্রতিকার হবে না।

সে দিন গান্ধীজীর মনে নিশ্চয়ই এই নির্মম সত্যের বেদনাবোধ হয়েছিল। জানি না, প্রবীণ জননায়ক ফিরোজ শাহ্ বুঝেছিলেন কিনা যে, এই তরুণই একদিন ভারতের মহাত্মা হবেন, তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টায় সত্যের আগ্রহে দেশ স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে সগৌরবে।

কলকাতায় পৌঁছলেন গান্ধীজী—স্বেচ্ছাসেবকদের জিজ্ঞাসা করে খুঁজে নিলেন রিপণ কলেজের আস্তানা—ঐখানেই ডেলিগেটদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। লোকমান্য তিলকেরও থাকবার ব্যবস্থা ছিল ঐখানে। দেশের বহু নেতা আসতেন লোকমান্যের কাছে, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় অন্যতম।

গান্ধীজীর সমস্ত জীবনটাই একটা ঈশ্বরনিষ্ঠ নিয়মানুগ ছন্দ, সেই ছন্দের সামান্য পতনও তাঁর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠত। স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে এই গুজরাটী যুবকের বহু আলাপ আলোচনা হয়—সেবার প্রকৃত আদর্শ কি, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের কি অবস্থা, এই প্রতিনিধি শিবিরগুলিকে আরো পরিচ্ছন্ন ও নিয়মনিষ্ঠ করা যায় না কেন, যাঁরা দেশসেবার বিরাট আদর্শে মিলিত হয়েছেন—কেন থাকবে তাঁদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ, শ্রেণীভেদ, বিভিন্ন রন্ধনাগার, শৌচালয়—কংগ্রেসের জনসেবা কি শুধু তিন দিনের উত্তেজনা—সারা বৎসর যদি দেশের জনগণের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, ঘর্ম যদি ঝরে না পড়ল, তবে কল্যাণ কি শুধু বক্তৃতায় করতালি দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণে, না টাউন হলে, না বার-লাইব্রেরীতে। গান্ধীজী দেখলেন যে প্রতিনিধিবর্গের বেশীর ভাগই আদেশ দিতে তৎপর। নিজে কিছু করতে নারাজ। পূতিগন্ধবহ শৌচাগারগুলির দিকে গান্ধীজীর দৃষ্টি পড়াতে স্বেচ্ছাসেবীদের তিনি বললেন যে, স্বাস্থ্যের খাতিরেও এগুলোর বিহিত হওয়া উচিত। তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন যে লোক বেশি, পায়খানা কম, তার উপর এসব মেথরের কাজ। সেদিন স্বেচ্ছাসেবক ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা আশ্চর্য হয়ে দেখল যে বিলাতফেরত এক ব্যারিস্টার নিজেই ঝাঁটা হাতে শৌচাগারে মেথরের কাজ নিঃসঙ্কোচে হাসি-মুখে করে যাচ্ছেন। সে দিন কি তাঁদের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়েছিল, ভারতের ভাবী মহামানবকে কি কেউ চিনেছিল সেদিন?

অন্য প্রতিনিধিরা সদলে কেউ বেরিয়ে গেলেন মহানগরী দর্শনে, কেউ ব্যস্ত আলাপ আলোচনায়, কেউ চললেন নেতাদের পিছনে পিছনে—গান্ধীজী ভাবলেন আলস্যে সময় কাটিয়ে লাভ কি—কংগ্রেসের এখনও দু দিন বাকী—আজেবাজে গল্প করে কি হবে, কংগ্রেস সংক্রান্ত কাজ কি কিছু নেই। কংগ্রেস

অফিসে গিয়ে খোঁজ করলেন তিনি, কংগ্রেসের সম্পাদকদ্বয় ছিলেন শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রমোহন বসু ও মহর্ষির জামাতা শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল। ভূপেনবাবু বললেন—না, আমার কোন কাজ নেই, আপনি না হয় ঘোষালবাবুর কাছে যান। এই ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাটীতেই গান্ধীজী পরে অতিথি ছিলেন এবং আতিথ্য সৎকার বাংলার মায়েরা কি রকম করে করেন তার সপ্রশংস পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষালের কাছে যেতে তিনি বললেন,—দেখুন, আমি ভারী ব্যস্ত—কাজ—তা এই চিঠিগুলা পড়ে শুনে জবাব লিখুন ত—

গান্ধীজী কাজে বসে গেলেন দ্বিরুক্তি না করে।

শ্রীযুক্ত ঘোষালের সঙ্গে গান্ধীজীর আলাপ জমে ওঠে ধীরে ধীরে—ছোটখাট কাজগুলো, এমন কি জামায় বোতাম লাগিযে দেওয়া পর্যন্ত গান্ধীজী করেন। প্রথমে একটু সন্ত্রস্ত হযে উঠেছিলেন ঘোষাল মহাশয়—রাজার লোক ব্যারিস্টার বিলাতফেরত, তাকে দিয়ে সামান্য কেরানীর কাজ বা ব্যক্তিগত কোনো কাজ করিযে নেওয়া মনে হত ভারী নীতিবিরুদ্ধ। গান্ধীজী বললেন—আপনি পিতৃ-তুল্য, আপনার নির্দিষ্ট কাজ বা একটু সেবা করা ত আমার পক্ষে গর্বের ও আনন্দের বিষয়।

গান্ধীজী কিন্তু কংগ্রেসের ধরনধারণ, বক্তৃতার বাগাড়ম্বর, নেতাদের চালচলনে ও ইংরাজী ভাষার ছড়াছড়িতে বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তখন থেকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল একে বহিরঙ্গের আড়ম্বর থেকে মুক্তি দিয়ে পঞ্চায়েতের ভিত্তির উপরে গড়ে তোলা।

কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে গোখলে ও ফিরোজ শাহেব সাহায্যে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হল এবং স্থির হল যে, প্রকাশ্য কংগ্রেসে পাঁচ মিনিটে তিনি তাঁর বক্তব্য সমাধা করবেন। গান্ধীজী ক্ষুণ্ণ হলেন—তাঁর প্রস্তাব কেউ কেউ বুঝলে, অনেকেই বুঝলে না, কিন্তু তবু জাতীয় মহাসমিতি তাঁর আন্দোলনকে স্বীকার করে নিলেন এইটাই তাঁর পরম সান্ত্বনা।

কংগ্রেসের পর এক মাস কলকাতায় রইলেন গান্ধীজী। গোখলে তখন কলকাতায়—গান্ধীজীকে তিনি আমন্ত্রণ করলেন নিজের কাছে থাকবার, ছোট ভাইএর মত। গোখলের বাড়ীতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের—সেই আকুমার ব্রহ্মচারী, যিনি ছাত্রদের মধ্যে বন্ধু হয়েছিলেন তপস্যায় সেবায় শিক্ষায়, যিনি তখন আট শত টাকা মাহিনা পেয়েও সাতশত ষাট টাকা খরচা করতেন পরার্থে।

কলিকাতায় বাসকালে গান্ধীজী সংকল্প করলেন বাংলাদেশের মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হবেন। তখনকার দিনে রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জি ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের নেতা, কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগও ছিল। খ্রীষ্টানুশাসনের প্রতি গান্ধীজীর অনুরাগও ছিল। গান্ধীজী যে দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান সেদিন তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। সাধাসিধে বাঙালীর মত ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা এই মহানুভব ব্যক্তিটিকে গান্ধীজীর ভালই লেগেছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও হয়েছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে—আদিম পিতামাতা ভগবদ্বাণী লঙ্ঘন করে যে পাপ করেছিলেন—পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জীব-কোষের মধ্য দিয়ে শাশ্বত মানব সৃষ্টির অবিচ্ছিন্ন ধারায় আজও যা সক্রিয়—তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি—

রেভারেণ্ড ব্যানার্জি উত্তর দিয়েছিলেন—কেন সেই পরম ত্রাতার শরণ নেওয়া, যিনি ভগবানের পুত্র—

গান্ধীজী বলেন—আমাদের ভগবদ্গীতাও ভক্তিমার্গে সেই কথা বলেন—মামেকং শরণং ব্রজ।

স্বামীজীর নাম তখন কন্যা কুমারিকা থেকে বদরিকা, ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় প্রসিদ্ধ—বীর সন্ন্যাসীকে দেখবার জন্য গান্ধীজী বেরুলেন পায়ে হেঁটে,—তীর্থযাত্রার নিয়মই ছিল পদব্রজে গমন, দেশের মাটির প্রত্যেকটি অণুকে অনুভব যাতে করা যায়। বেলুড় মঠে গিয়ে শুনলেন, স্বামীজী অসুস্থ হয়ে কলকাতায় গেছেন। দুই বিরাট পুরুষের মরদেহে সাক্ষাৎ হল না—ভাবজগতে নিশ্চয়ই হয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল যেন; প্রথম-দিনের আলাপ গান্ধীজীকে গভীরভাবে স্পর্শ করে নি। পরে তিনি তা স্বীকার করে এই নিবেদিত-প্রাণ মহিলার উৎসাহ ও সেবার প্রশংসা করেন।

পঞ্চাশ বছর আগে বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের অবদান ছিল—তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি নেতাদের বক্তৃতা শুনতে যেতেন গান্ধীজী, তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও হত, কেশব সেনের জীবনী ও বক্তৃতা তিনি শ্রদ্ধাসহকারে পড়েছিলেন।

এই সময় তিনি একদিন মহর্ষির সঙ্গে দেখা করবার জন্য জোড়াসাঁকোয় যান। মহর্ষি তখন অসুস্থ। দ্বারকানাথ ঠাকুর গলির এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভবনে সেই তাঁর প্রথম শুভাগমন। সে দিন কি কেউ জানত যে এই মুক্ত বেণীর তীর্থসঙ্গমে ভারতের দুই বিচিত্র ধারার মিলন হবে একদিন—একদিকে 'মহো অর্ণঃ

সরস্বতী' আর এক দিকে 'মহান্ আত্মা যো হি দেবো বিশ্বকর্মা'—হরির সঙ্গে হরের। কে জানত যে এই অপরিচিত দর্শকই কবিগুরুর স্বপ্নের জনগণমন অধিনায়ক পথ-পরিচায়ক হবেন, কবির কল্পনা সার্থক করবেন কর্মে।

সেদিন গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা বা কথা হয়েছিল কি-না জানা নেই। ঐ সময়ে ঠাকুর বাড়ীতে ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে গানের জলসা ছিল। গান্ধীজীকে সেখানে সাদরে আহ্বান করা হয়। বাংলা গানের উচ্ছল রসধারার মধ্য দিয়েই ঠাকুর বাড়ীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়—সে দিন থেকেই সেই সুর-লক্ষ্মী অলক্ষ্যে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।'

তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায়' সেই সুর-লক্ষ্মীরই আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। সে দিনের কথা স্মরণ করেই কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা বলি, "তোমরা জয়ধ্বনি কর তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছুক তাঁর আসনের কাছে। বল, তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।"

॥ সাতাশ

দক্ষিণের পথে বিপথে ঘুরে বেড়াবার সৌভাগ্য তখন হয় নি। হঠাৎ আমন্ত্রণ এসে গেল বাঙ্গালোর থেকে নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য, কানাড়া সাহিত্য-শাখার উদ্বোধন করতে হবে। মন বললে তথাস্তু। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর,—বাঙ্গালোর থেকে পণ্ডিচারী, সেখান থেকে মহাবলীপুরম, পক্ষীতীর্থ ঘুরে মাদ্রাজ হয়ে আবার ত্রিবান্দ্রম্ কন্যাকুমারী মাদুরা হয়ে প্রত্যাবর্তন—দক্ষিণের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এঁকে দিলে আমার মনে। ভাবি এই বিস্তীর্ণ দেশের আমরা কেউ উত্তরে কেউ দক্ষিণে জন্মগ্রহণ করেছি। বদরিকা থেকে কন্যাকুমারিকা গেছি, দ্বারকা থেকে কামরূপ কামাখ্যা, কিন্তু এর ইতিহাস শুধু ত মৌর্যকুশান, সাতবাহন, হুন, শক, গুপ্ত, পল্লব, চালুক্য, চোল, পাঠান, মুঘল, শিখ, মারাঠা বা ব্রিটিশের ইতিহাস নয়, এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা জীবন্ত ও গতিশীল, যা একক নয়, বৈচিত্র্যময়, যেখানে নটরাজ ও পার্বতীর সঙ্গে বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বর একাসনে বসেছেন, সোঽহং এর সঙ্গে

সববুটা হ্যায়, যে বাণী জাতি সীমা, শ্রেণী গোষ্ঠী ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমানের ঊর্ধ্বে উঠে বলেছে 'আমি থামব না' (I will not rest)। মনে পড়ল ভারতের মহিমা যে দিন আপন অঙ্গন সীমা পেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল নারিকেলকুঞ্জের মাঝে সে দিন শুধু ভাষায় ভাষায় গিঁঠ পড়ে নি, প্রাণের সঙ্গে প্রাণও দুলেছিল। অস্ত্রের ঝনঝন নয়, মদমত্ত সাম্রাজ্যের গরম নয়, মৈত্রীকরুণা মন্ত্রের আভাস।

বিষ্ণু আমায় কইল কানে বলল দশভূজা
অজানা ঐ সিন্ধুতীরে নেব আমার পূজা

গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরীর জল এক হয়ে মিশল আমার কোষ-সম্বল অর্ঘে, পূজার পাত্রে, ব্যর্থহীন নৈবেদ্যে।

সম্মেলন শেষ হল, বক্তৃতার ঘটা, মিষ্টি করে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলার পালা শেষ হল, শ্রীরঙ্গপত্তন মহীশূর ঘুরে আসা গেল, সন্ধ্যায় বৃন্দাবন গার্ডেনস্ আলোকোদ্ভাসিত হল—আমার মন পড়ে রয়েছে পথে। তমালতালীবনরাজি-নীলা ডাক দিচ্ছে। বন্ধুবর অতিথি বৎসল প্রহ্লাদ বসু সস্ত্রীক মোটরে পণ্ডিচারী যাবেন, আমাদের করে নিলেন পথের সাথী। কপাল ভাল, এই পথে পড়ে অরুণাচলের ঋষির আশ্রম আর কয়েকটি বৃহৎ মন্দির।

দক্ষিণের বিরাট মন্দিরের, তাদের স্থাপত্য, কারুকার্য, গোপুরমের কথা অনেকে বলেছেন। তার ইতিহাস নতুন করে না বললেও চলবে।

রাত্রির তৃতীয় যামে এক তরুণ তাপস তড়িতাহত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে—কে যেন তাঁকে ডাকছে। স্কন্দপুরাণে তিনি পড়েছেন তীর্থশ্রেষ্ঠ অরুণাচলের কথা, স্বয়ং শিব যার কেন্দ্রে অধিষ্ঠান। উন্মাদ হয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান দেশে দেশে অরণ্যে কান্তারে—দেখা দাও, দেখা দাও। হঠাৎ এক শুভক্ষণে লগ্ন এল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে উঠেছে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত একটি রেখা; সামনে দাঁড়িয়ে অরুণাচল—এস বন্ধু এস, সব পথ এসে মিশে গেছে আমার এই আশ্রয়ে। বিদ্যুৎ দৃষ্টিতে দেখলেন তিনি, স্থাণু পাহাড় হয়ে উঠেছে বাঙ্ময় প্রাণময় চিন্ময়, শ্যামলসুন্দর প্রশান্ত মহেশ্বর। ঝরঝর করে চোখ দিয়ে জল পড়ে—কি অপরূপ বেশেই দেখা দিলে প্রভু—ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।

ইনিই তামিল দেশের বিখ্যাত মহর্ষি রমণ। সুপ্রসিদ্ধ লেখক পল্ ব্রণ্টনের লেখাতেই তিনি প্রথমে প্রতীচীর কাছে প্রচারিত হন A search in Secret India, A message from Arunachala প্রভৃতি পুস্তকে। মহর্ষি নিজে একজন তামিল কবি। তাঁর দু একটি কবিতার ক্ষীণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করছি—

মৌনী মুনি ধ্যানী অরুণাচল
ঊর্ধ্বশীর্ষ, বিলীনাক্ষ, হে অতল
উদয় অচল চূড়ার স্তব্ধ উপান্তে
সমীরিত আকাশের নিমীলিত সীমান্তে
মুক্ত মহাকাল অতন্দ্র আছ জাগি
যুগ যুগ ধরি তব ভক্ত লাগি
কে বলে তোমায় শুধু পাথরে গড়া অচঞ্চল
নির্বাক নিষ্প্রাণ নিশ্চল
নও তুমি নও তুমি
পাষাণ তৃণগুল্ম গিরিদরীভূমি
মসী লেপা ধরণীর বুকে
তুমি দিলে এঁকে
কালো ঘেরি মরকত রেখা
অলোক আলোকের লিখা
মগ্ন অগ্নি স্তম্ভ
হিরণ্ময় হিরণ্যগর্ভ।

মহর্ষি রমণ প্রাচীন সিদ্ধান্তীদেরই ধারা বয়ে নিয়ে এসেছেন আজকের এই যুগে। হাজার বছর ধরে কত গান কত গাথা কত কবিতা 'শিব' আর 'বিষ্ণু'কে ঘিরে গড়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই, কত দিব্য প্রবন্ধ কত দেবহার হয়েছে গাঁথা। কত শিবপাদহৃদয়, সম্বন্ধর, মাণিক্যভাস্কর, অপ্পর স্বামী, সুন্দরেশ, কতো শঠকোপ স্বামী, পল্লবনাড়ু, চোলনাড়ু পাণ্ড্যনাড়ুর আড়বাররা, তিলকাবতী, পুস্তাবতী, অক্কমহাদেবী, অণ্ডাল, ছিন্নমল্লিকার্জুনের সেবক বীর শৈববাদীরা, শঙ্কর রামানুজ কাম্বান কত শ্রীভাষ্য যে ইতিহাসকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে তার তুলনা নেই।

॥ আটাশ

পণ্ডিচারীতে এসে রথ থামল। এ কালের ঋষির আশ্রম, যুগোচিত ব্যবস্থা। মহাসমাধির বেদীপ্রান্তে শুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালুম কিছুক্ষণ। শান্ত পরিবেশ, শুধু ফুল দিয়ে ঘেরা নয়, মন দিয়ে তৈরি। ঝরঝর করে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে লাজ-বর্ষণের মত, বৃক্ষদেবতা নিজেই অর্ঘ্য দিচ্ছেন ঝরা পাতার মেলায়, ফুলে পল্লবে। নমস্কার জানিয়ে সমুদ্রের কাছে গেষ্ট হাউসে চলে গেলাম। ব্যবস্থা সুনিপুণ, আরাম আয়োজন আধুনিক। শ্রীঅরবিন্দকে আমরা বুঝি না, তাঁর সাধনার কথা বোঝবার চেষ্টাও করি না কারণ আমাদের মনে আছে কবি নিশিকান্তের ভাষায় "অবিশ্বাসী চেতনার আত্মঘাতী ভাতি,...সন্দেহের ছায়াময় প্রশ্নলীন কথা, বিজড়িত জিজ্ঞাসার কূটতর্ক, জটিল জিগীষাপূর্ণ আত্মপ্রবঞ্চনা, ভ্রান্তবীর্য"।

১৮৯৩ সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর মনে যে অদ্ভুত ভাবান্তর হয় এবং তিনি যে এক ভূমাময়ী অচঞ্চলার মূর্তি দেখেন সে কথা তাঁর নিজের মুখেই আমরা শুনেছি। হিমালয়ের রজতশুভ্র তুষার মুকুটের মাঝে তিনি রত্নাকল্লোজ্জ্বলাঙ্গ শিবকে দেখেছেন, নর্মদার তীরে মহাকালীর অনুভব তাঁর হয়েছে, এসব কথা ছেড়ে দিলেও বরোদাবাসের চোদ্দ বৎসর তাঁর কাছে বাণী সাধনার যুগ—তিনি পড়ছেন, তিনি বুঝছেন—বেদ বেদান্ত তন্ত্র উপনিষদ গীতা পুরাণ ইংরাজী সংস্কৃত বাংলা ফরাসী গ্রীক লাটিন, তিনি লিখে চলেছেন কাব্য নাটক প্রবন্ধ অন্তরের ধ্যানের নির্দেশে। বঙ্কিমচন্দ্র মারা গেলেন ১৮৯৪ সালের এপ্রিলে। একুশ বছরের যুবক অরবিন্দ, যাঁর চোদ্দ বছর কেটেছে বিলাতে শুধু ইউরোপীয় রীতিনীতির শিক্ষাদীক্ষায়, তার ভাষা ও সাহিত্য দর্শন চর্চায়, যার সঙ্গে বাংলার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি তিনি বঙ্কিম প্রয়াণের তিন মাসের মধ্যেই তাঁর সাহিত্য ও সাধনার যে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করলেন, সমালোচনা সাহিত্যে আজও তার বিচার আদরণীয়। আবার তিনি কলম চালালেন তখনকার দিনের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, তার আবেদন নিবেদনের নীতিকে খান খান করে কেটে দিলেন—ইন্দুপ্রকাশে প্রকাশিত হল সাতটি প্রবন্ধ New Lamps for the Old. ১৯০৬ সালে তিনি কলকাতায় এলেন—এ ত আগমন নয়—এ হল আবির্ভাব—জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (যাদবপুরের)

হোতা হয়ে। সারা দেশ বেয়ে এক ঝড়ো হাওয়া তখন বয়ে চলেছে বাংলাদেশকে খণ্ডিত করার প্রশ্ন নিয়ে। বাংলার মাটি, বাংলার জল ধন্য হক পুণ্য হক, কবি সেই গান গাইছেন, রাজনীতিকরা জোর গলায় মিটিং করছেন, বয়কট করছেন—চতুর্দিকে এক নূতন উন্মাদনা, এক জনজাগরণ—মোটে চার বছর তিনি কলকাতায় ছিলেন—সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম, যুগান্তর, কর্মযোগিন নিয়ে। রাজনীতি বিপ্লবনীতি করছেন কিন্তু আত্মসমাহিত—দেশের জন্য অদ্ভুত মমত্ব বোধ আবার নিরাসক্তিও। সাদাসিদে অতি সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন, আঠারো ঘণ্টা করে দিনে খেটেও তিনি ক্লান্ত নন, সারাদিন ধরে লিখেও তিনি অবসন্ন নন।

এই সময়েই তিনি তাঁর স্ত্রীকে কয়েকটি পত্র লেখেন। তার মধ্য দিয়ে তখনকার দিনের শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্ট হয়েছেন অপরূপভাবে; তিনি বললেন আমার তিনটে পাগলামী আছে—প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন সে সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকী রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত।.........কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া সত্যি সত্যি যাহা দরকার তাহা কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা......তুমি মত দিলেই...।

দ্বিতীয় পাগলামীটা এই যে, কোনো মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিতে হইবে...এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই। যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব।

তৃতীয় পাগলামী এই যে, লোকে স্বদেশকে জড়পদার্থ, কতকগুলো মাঠক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মায়ের বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?

তিনি যখন পণ্ডিচারী যান তখন অনেকে বলেছিল যে তিনি escapist—পালিয়ে গেলেন পণ্ডিচারীতে, যোগের ধোঁয়ার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন; তারা ভুলে গেছল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা "Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this

agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. His words will be echoed and reechoed." আলিপুর জেলেই তিনি দেখেছিলেন কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে, সারা জেল ঘিরে দেওয়াল কোথায়—সবই বাসুদেব। 'তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন, তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়ে আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষাত্র তেজই একমাত্র তেজ নয়, ব্রহ্মতেজ আছে।' তাই ১৯১০ সাল থকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত জীবনের এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি আত্মসমাহিতির মধ্যেই কাটালেন, ক্লান্ত শ্রান্ত পর্যুদস্ত হয়ে নয়, আমূল পরিবর্তনের পন্থা আবিষ্কার করতে, ঊর্ধ্বতর লোকের এমন এক আলোকে নামিয়ে আনতে যা বিশ্ব-মানবকে করবে অমৃতের অধিকারী। ব্রহ্মবান্ধব সাধ করে কি আর বলেছিলেন—ইনি হচ্ছেন মানস সরোবরের অরবিন্দ।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে শ্রীঅরবিন্দ যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন যে স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্মদিন ১৫ই আগস্ট—এক অধ্যায়ের শেষ, আর এক অধ্যায়ের শুরু—নতুন রাষ্ট্র যে গঠিত হল তার আছে অপরিসীম সম্ভাবনা (untold potentialities) যা সমগ্র মানব জাতিকে রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করবে। তিনি আরও বললেন যে আমার নিজের জন্মদিনে যে এই শুভলগ্নটি এল আমার কাছে তার অর্থ হচ্ছে যে ভাগবতী শক্তি আমার কাজের সমর্থন করেছেন। ভারতবর্ষের কাজ হবে "to live also for God and the world as a helper and leader of the whole human race."

ভারতবর্ষের অতীতকে তিনি দেখেছেন মহা-ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে, তার সাধনা, তার কৃষ্টির এমন সুন্দর বিচার দুর্লভ, তিনি অমেয় আশা জাগিয়ে দিচ্ছেন যে

'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

রবীন্দ্রনাথের কথাতেই শেষ করি—প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের

মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলাম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহো নমস্কার। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগলভ স্তব্ধতায়, আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

॥ উনত্রিশ

সেদিন ভোরে, দিগন্তের অরুণ উপান্ত তখনও ভাল করে আলোয় ভরে ওঠে নি; মহাতামসীর গর্ভ হতে জাগছেন জবাকুসুমসংকাশ দেবতা। তিন দিকে তিন সমুদ্রের উদার বিস্তৃতি। ঊর্ধ্বে নীলিম আকাশ, নিম্নে নিমীল পৃথিবী। আমরা বেশ কয়েকজন মানুষ—আমেরিকান নরউইজিয়ান ইংরেজ, বাঙালী মাদ্রাজী মারাঠী ছেলে-বুড়ো পুরুষ-স্ত্রী, অজ্ঞ বিজ্ঞের দল ভারতের মাটির শেষ বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছি, গান্ধী-মন্দিরের তৃতীয় তলার উন্মুক্ত চত্বরে। ঊর্ধ্ব মুখে চেয়ে আছি অবাক দৃষ্টি নিয়ে, দেখছি আকাশের কোন্ কোণে, কালোর অতল কোলে কেমন করে আলোর চিড় ধরে, সমুদ্রের বুকে জ্যোতির্ময় উন্মেষ হয় কোন্ অপরূপ শৃঙ্গারের বেশে। কবির ভাষায় বলতে গেলে হে মাধবী দ্বিধা কেন। একটু, একটু, একটু—আরও, আরও, আরও —হঠাৎ যেন সমস্ত আকাশ লাল হয়ে উঠল। তিন সমুদ্রের সঙ্গমে তীর্থস্নান সেরে হিরণ্ময় পাত্রখানি মাথা তুলল। আকাশের মেঘহীন নীল নিভৃতিতে ছড়িয়ে দিলেন দিনমণি নিজেকে দিকললনার আলিঙ্গনে। মিলিয়ে গেল অনতিগুণ্ঠিতা উষার অভিসার, পালাল মায়াবিনী মঘোনী রিতাবরী। কবির সঙ্গে বললাম, সূর্যদেব তোমার দক্ষিণে এই প্রভাত, তোমার বামে ওই সন্ধ্যা, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক—এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করুক।

ওরে মন খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক পানে তুলে দে

সূর্য উঠেছেন—চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্—তিনি তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে, চক্ষুর্মিত্রস্যবরুণস্যাগ্নে—এ যেন বিশ্বভাবন পরম মিত্রের চোখ, সে দৃষ্টিতে করুণাপ্লাবিত হচ্ছে, বরুণের ধারার মত, সে দৃষ্টিতে ভূতভাবন অগ্রণী অগ্নির শুদ্ধ সৃষ্টি। মনে পড়ছে শতপথব্রাহ্মণের গল্প—ঋষি চলেছেন পূর্বান্ত

হয়ে বরদবেদমন্ত্র কণ্ঠে, সরস্বতী তীর হতে আহিতাগ্নি হাতে। উষার উদয় পথে সে যাত্রা। তাই ত নাম হল প্রাগজ্যোতিষ। তমালতালীবনরাজি-নীলার মাঝেও দেখেছি সে যাত্রা। ঋষি অগস্ত্য চলেছেন—চরৈবেতি চরৈবেতি—শ্রান্ত হয়ো না রোহিত, এগিয়ে চল।

গতকাল সন্ধ্যায় ত্রিবান্দ্রম থেকে এসেছি কন্যাকুমারিকায়, এখান থেকে যাব মাদুরায়। প্রথম পরিচয়ের নবোঢ় গূঢ় ইঙ্গিত রাত্রের স্তিমিত প্রদীপের আবছা আলোয়। আজ সকালে হল তার গুণ্ঠন মোচন। অল্প দূরেই মগ্নশৈলের চূড়াগুলি ছুঁয়ে বিবেকানন্দ রক্‌স্‌। ওইখানেই বসে থাকতেন পরমশৈব তাপসপ্রবর। তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ কি ফুটে বেরিয়েছে ভুনা-ওয়ালার চুপড়ি থেকে, মুটেমজুর মুদ্দফরাসের ঝুড়ি থেকে, ভাঙ্গীর ঘর থেকে, রামকৃষ্ণের স্বপ্ন কি সফল হয়েছে, জীবই শিব, চিদানন্দময় আমি। ভারত ভুলিয়ো না, তোমার উপাস্য দেবতা উমাপতি শংকর। শিবোঽহং, শিবোঽহং।

আজ সকালে আলোর দরবারে যাই বলি না কেন কাল রাত্রের নিভৃতে তাঁকে বলে এসেছি, হে সুন্দরেশ, হে মহেশ্বর, হে লোকনাথ, হে ত্রিলোকী, তোমাকে শত সহস্র নামে পূজো করতে পারি, কিন্তু বলব না যে তুমি প্রেমিক, তুমি রসিক, মরমী দরদী, তুমি ত নিষ্ঠুর গরজী, মানসমুকুল ভাজো আগুনে। এসে দেখে যাও কার জন্য আজও মালা হাতে প্রতীক্ষমানা ওই কুমারী। তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে যে মঙ্গলস্নান করে বিশুদ্ধগাত্রী হয়ে, পতিমিলনের উপযুক্ত বসন পরে বর্ষার জলাভিষেকের অবসানে কাশকুসুমে প্রফুল্ল বসুধার মত কন্যা অপেক্ষা করছিলেন তোমার সঙ্গে মিলনের তরে। আসছেন তাঁর প্রিয়—প্রিয়তর, প্রিয়তম, লগ্ন যে ভ্রষ্ট হয়, এলে না তুমি নিষ্ঠুর মালা তুলল না দয়িতের কণ্ঠে, চোখে চোখে হল না দৃষ্টি বিনিময়, মনে মনে লাগল না তুফান। সিন্ধুতীরে বিরহ হয়ে উঠল নিবিড়, গভীর, মর্মভেদী দুঃসহ, তবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কুমারী অনন্যা। আজও তিনি দাঁড়িয়ে অতন্দ্র, উদাসিনী কপালিনী ভৈরবী। কেমন করে তাঁকে ডেকে বলি, রাই জাগ, রাই জাগ, শুকসারী সংবাদ এনেছে। কাল সন্ধ্যারাতে দেখে এসেছি তাঁকে, মন্দ্রমুখরা শঙ্খঘণ্টার আরতির মাঝখানে ফুল-নারিকেলের অর্ঘ দিয়ে বন্দনার মন্ত্র পড়তে পড়তে বলেছি, দেবী, চিরবিরহিণীর বাণী তোমার বুকে, তবু তুমি ত শুধু অন্নপূর্ণা নও, সদাপূর্ণা—দাও তোমার সেই বিরহবিজয়ী মন্ত্রখানি ফাঁস করে, পৃথিবীর সব তপ্ত ক্লান্ত আতুর মানুষ-মানুষীর কাছে! তুমি ত বিদ্যাপতির গৌরীর মত শিবের পিছনে ছোট নি—

দেবগৃহে বীণাবাদিকাদের। সন্তঃমিলনের পরিভূষিত উৎসবই শেষ কথা নয়। মহাভারতের সভাপর্বে উল্লেখ আছে যে সহদেব মাহিষ্মতী নগরে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে সেখানে যজ্ঞাগ্নি জ্বালাবার ভার মেয়েদের উপর। চারুওষ্ঠের ফুৎকার ছাড়া হোমশিখা প্রজ্জ্বলিত হত না। দক্ষিণে নারীর স্থান উচ্চে—দ্রাবিড় সভ্যতার এই একটি বিশেষ দান—মাতা সেখানে পূজিতা। মাদুরা-সম্পর্কে আর একটি পুরনো গল্প বলেই শেষ করি। গল্পটি 'শিলপ্পধিকরম' নামে বিখ্যাত কাব্যনাটক থেকে নেওয়া। একে বলা হয় 'The epic of the anklet।' কোবিলন ছিলেন এক ধনীপুত্র ; কন্নগী নামে এক শ্রেষ্ঠীদুহিতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কয়েক বৎসর নিরুপদ্রবে প্রণয়মধুর জীবন যাপন করবার পর মাধবী নামে এক নর্তকীর প্রেমে পড়েন কোবিলন এবং তারই সঙ্গসুধারসে নিমগ্ন হয়ে শুধু সময় নয়, অর্থসামর্থ্য সবই জলাঞ্জলি দেন। তারপর মধুপানে তৃপ্ত হয়ে মাধবী তাঁকে দেয় তাড়িয়ে। ফিরে আসেন তিনি সাধ্বী কন্নগীর কাছে। কন্নগী তাঁকে পুনরায় ব্যবসায়ে মন দিতে বলে—নিজের পায়ের বিশুদ্ধ স্বর্ণের মল খুলে দেয় তাঁর হাতে। এই পদভূষণটি নিয়ে কোবিলন আসেন মাদুরার স্বর্ণবণিকের কাছে বিক্রয়ের জন্য। ঠিক এই সময়ে রাণীরও একটি অলঙ্কার চুরি যায় এবং কোবিলনই সেই তস্কর এই সন্দেহে তাঁর বিনা বিচারে শিরশ্ছেদ হয়। কন্নগী স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনে পাগলিনীর মত রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তার অন্য পদভূষণটি রাজাকে দেখায় এবং রাজসভার বাইরে এসে চিৎকার করে বলে,

শোনো শোনো মাদুরার সতীলক্ষ্মীরা শোনো
আমার স্বামীকে হত্যা করেছে যারা, তাদের কথা বলি আমি,
বিচারের সিংহাসনে বসে অবিচার করেছে তারা
শোনো মাদুরানিবাসীরা শোনো

মাদুরাবাসীরা তার কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললে—হ্যাঁ, বিচার চাই, আমরা, মাদুরাবাসীরা।

রাজা বসে আছেন সিংহাসনে—বিচার চাইলে নারী, তার সঙ্গে সেই উদ্বেলিত-হৃদয় জনতা।

রাজাও সেই স্তরের লোক : ভুল হয়েছে, আমি রাজধর্ম প্রতিপালন করতে পারি নি, মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়।

রাজা মারা গেলেন—স্বেচ্ছামৃত্যু। কিন্তু কন্নগীর ক্রোধ উপশম হয় না। সে বললে রাজার মৃত্যু হয়েছে বটে কিন্তু রাজ্যের বিনাশ হবে, অভিসম্পাত

দিচ্ছি আমি—সতীসাধ্বীর অভিসম্পাত। অগ্নি উঠবে জ্বলে, দেবতারা চলে যাবেন নগর ছেড়ে।

মীনাক্ষীদেবীকে প্রণাম করে, তিরুমলনায়কের প্রাসাদ পিছনে ফেলে, হাজার স্তম্ভের সভামণ্ডপকে নমস্কার জানিয়ে তিরুপ্পরণকুণ্ডরম মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। নমস্কার করলাম দক্ষিণকে, তার দাক্ষিণ্যকে, তার শ্রদ্ধাকে, তার নিষ্ঠাকে। ভাবলাম নতুন যুগে, নতুন ভাবের বন্ধনে কি রূপ নেবে সেদিনকার স্বপ্নগুলি! প্রশ্ন রয়েই গেল। ততঃকিম্।

॥ ত্রিশ

প্রাচীন তামিল সাহিত্যের ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য বা বৈদগ্ধ্যের কথা ইতিহাসভুক্ত হলেও তার সম্যক চিত্রটি আমাদের চোখে সব সময়ে পড়ে না। দূরে দক্ষিণে তমালতালীবনরাজিনীলার বেলাভূমিতে দ্রাবিড় দেশে কোন্ তামির-মুনি সন্ধ্যাবেলায় কার অপেক্ষায় বসে ছিলেন কে জানে! কবিবর হেমচন্দ্র তাই বুঝি গেয়েছিলেন যে, গিরিবর বিন্ধ্য আজও শুয়ে তার প্রতীক্ষায়। অগস্ত্য ঋষি ফিরেছিলেন কি না আমরা জানি না, কিন্তু আমরা দেখেছি দ্রাবিড়ে আর্যে ভাবে ভাষায় রূপে রসে অপূর্ব মিশ্রণ, আর্যীকরণের সমীকরণে নূতন প্রাণের সন্ধান, সমাজ-জীবনে নূতন চিন্তার বিন্যাস, উত্তরে দক্ষিণে দুইটি বিরাট প্রাণবন্ত সংস্কৃতির মিলনসূত্র। এই যে ঐক্য, এই যে সমন্বয়ের ধারা, এই ত ভারত ইতিহাসের চলন্ত মন্ত্র, অমোঘবাণী। মহাকবির স্বপ্নে যে মহাসত্য প্রতিভাত হয়েছিল এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে, তার পরিচয় তামিল সাহিত্যের প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে। আমরা পেয়েছি সঙ্ঘমযুগের কত কবিদের, বৈয়াকরণিকদের, শিল্পীদের, সাধকদের, শৈবসিদ্ধান্তীদের, বৈষ্ণব-আড়বারদের, প্রবন্ধকারদের, দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদের, আচার্যদের। আমরা পেয়েছি তিরুকুরলের মত সাহিত্য, শিল্পপদিকরম, মণিমেখলই, জীবকচিন্তামণি, ইন্ন-ই-নারপতুর মত কাব্য ও নাটক, কাম্বানের রামায়ণ, কত শৈবগাথা, কত বৈষ্ণব পদাবলী। এঁরা ত শুধু সাহিত্য গড়েন নি, মনোরম চিত্র আঁকেন নি, সাধকশিল্পীর গোষ্ঠী তৈরি করেন নি, এঁরা শাশ্বত ভারতের রসময় মূর্তিকে নবরূপে উজ্জীবিত করে একটি মহান ঐতিহ্যকে ঐক্যের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করে

॥ একত্রিংশ

কবি একদিন গেয়েছিলেন—সব দেশে মোর ঠাঁই আছে, আমি সেই দেশ লব খুঁজিয়া। সারা পৃথিবী জুড়ে এই খোঁজার বিরাম নেই। শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন মানুষ ছুটেছে, চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে, দুর্গম গিরিকান্তার মরু পার হয়ে। দুস্তর তরঙ্গ ভেদ করে তার অর্ণবযান ছুটেছে, পথ পাহাড় ভেঙ্গে চলেছে ট্রেন, আকাশের ছায়ায় ছায়ায় তার উড়োজাহাজ উড়েছে আকাশিনী চামুণ্ডার খোঁজে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে তার দৃষ্টি—তিমিরহৃদবিদারণ স্পুটনিক তার প্রতীক। মহাকালের ইতিহাসের পাতায় এই যাত্রী মানুষই লিখে যাচ্ছে জনগণের মনের কাহিনী—সেই গণেশের কলম কোনো দিন থামে না। সাধারণতঃ লোকে জিজ্ঞাসা করে থাকে অমুক দেশে যে গেলে তুমি কী দেখে এলে—আমরাও ফলাও করে বলে থাকি রঙে রসে জরিয়ে জারিয়ে রাঙিয়ে কী দেখে এলাম, কী খেয়ে এলাম, কত বড় বাড়ি, হোটেল, প্রাসাদ, মর্মর চত্বর, আর্ট গ্যালারি, তার জনপদ, তার সভাসমিতি, দোকান হাটবাজার, তার সাহিত্যসমাজ, জীবনবিন্যাসের ধারা, আমায় তারা কত খাতির করলে, কত বাহ্‌বা দিলে। কিন্তু কী নিয়ে এলাম, তার কোন্ মন্ত্রটি, কোন্ ছন্দটি, আমার মনের গোপন কোণে কে এল গেল, কোন্ বিদেশী সুর জাগালে, কো্ বিদেশিনী ঝঙ্কার দিলে, কারে আমি বলে এলাম, চুপিচুপি কানে কানে, রাতের অত্যন্ত গভীরে, দিনের প্রখর আলোয়, স্তব্ধ সন্ধ্যায় সোনার বরণ প্রাতে—চিনি গো, চিনি তোমায়। তা না হলে শুধু ফুলের মেলা রঙের খেলা দিয়ে কী দেখে এলাম সেই কাহিনীর কঙ্কালকে ঝকঝকে চকচকে রাংতায় মুড়ে সদ্য উত্তেজক জরদার মত পরিবেশন করা যে যায় না তা নয়, কিন্তু তারও পিছনে ইতিহাস লক্ষ্মীর কনকাঙ্গুলি হাতে যে সোনার ঝাঁপি বাঁধা আছে তার কথা বলা যায় না, অনাদৃত জীবন-ছবির আনম্র ছায়াটুকুও ধরা পড়ে না মনের সিসমোগ্রাফে। দেশ ত মাটিকে নিয়ে নয়, দেশ মানুষকে নিয়ে—অতলান্তিকের পারেই তারা থাকুক আর প্রশান্তের নারিকেলকুঞ্জেই তারা বাসা বাঁধুক, ভল্গার কোলেই হক আর গঙ্গার উপকূলেই হক। তার ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের মমীর দেহেই পাওয়া যাক আর কালকের কনফারেন্সের বৈঠকেই লিখিত হক,

সবই এহ বাহ্য। যেমন অবান্তর তার গায়ের চামড়ার রং সাদা না কাল, হলদে না শ্যাম, তার অস্ত্রে শৈলদলন লৌহচলন শক্তি আছে কিনা। কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখা যায় এই প্রশ্নগুলিই উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, জগন্নাথের রথ অচল—সভ্যতার পিলসুজ বেয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে—সৃষ্টির গতি চলছে আকস্মিকের মালা গেঁথে দমকে দমকে, গমকে গমকে, ঝাঁপতালের লয়ে।

জীবনের সূত্র বাঁধা পড়েছে শুধু দ্বন্দ্বমূলক জগতে জীবিকার জন্য তাড়নায় নয় পরিবেশের (Ecology) মাঝেও।

আমেরিকা ঘুরে এসে এই কথাই মনে পড়ছিল বারে বারে। ক দিনই বা বিদেশে কাটিয়েছি, কতটুকুই বা দেখেছি। একটা বিরাট মহাদেশকে বুঝতে গেলে, একটা প্রাণবন্ত জাতিকে জানতে গেলে, তার পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার কথা বলতে গেলে যে ধ্যানধারণা মনন চিন্তার দরকার, তার কতটুকু আমরা দিতে পারি। তবু আজকের দিনে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে—ভোরের সূর্যের সঙ্গে চা খেয়ে পাড়ি দিলে একদিনেই লণ্ডনে প্যারিসে আসর জমানো যায়। কলকাতা থেকে বম্বে চলে এলাম এক লাফে ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে—কত না রেবা শিপ্রা উজ্জয়িনী নর্মদা বিন্ধ্য পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে—কিন্তু দেখতে পেলাম না পাহাড়ের স্বপ্ন, আকাশের অনন্ত, লীলায়িতা মদালসার রূপমাধুরী, সন্নতাঙ্গী গৌরীর মঞ্জীরধ্বনি, মুকুলভারে নম্র অশোকশাখার কম্পন।

সান্তাক্রুজে নতুন এক বিরাট বিমান বন্দর গড়ে উঠেছে—দেশবিদেশের জেটপ্লেন সেখানে নামবে। ঘণ্টা কয়েক সুরম্য এয়ার হোটেলে মহামান্য রাজঅতিথি হয়ে বিকালে যখন উড়োজাহাজ আবার ছাড়ল তখন মধুর বহিছে বায়ু ভেসে চলি রঙ্গে। আমি নিশীথ রাত্রির সভাকবি নই, মন্দাক্রান্তা ছন্দ আসে না, শিখরিণী, স্রগ্ধরা মালিনীকে চিনি না, জানি শুধু শার্দূল-বিক্রীড়িতের কথা, তাই ছন্দবিহীন হয়েই এগিয়ে চললাম অন্ধকারের গভীরে। ভিতরে চলছে শ্যাম্পেন শেরীর আধারের টুংটাং, আমি চেয়ে আছি বাইরের দিকে, মাটির আঠারো হাজার ফিট উর্ধ্বে চলেছি আমরা। রাত্রির এই তামসীরূপের ছটা যিনি না দেখেছেন তাঁকে বোঝান ভার কী এর ব্যাপ্তি। মহাকাল যেন মহাকালীকে কোলে নিয়ে ধ্যানের নৈঃশব্দে ডুবে গেছেন—এই দিগম্বর কালোর মধ্যে কিন্তু কোথাও মালিন্য নেই। নীল আকাশ জুড়ে হাজার হাজার তারকার দীপ্তি যেন চুমকী বসান, নীলাম্বরী পরে মৃন্ময়ী সেজেছেন চিন্ময়ী।

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে মেডিটারেনিয়ানের সাথে দেখা হল

লেবাননের বেরুটে। ওখানে তখন রাজনীতি তপ্ত ঘোরাল হয়ে উঠেছে। উনোর পরিদর্শকরা চলেছেন, ভারতের রাজ্যেশ্বরদয়াল ত আমাদের সহযাত্রীই ছিলেন। বেরুট চমৎকার শহর—এখানকার আমেরিকান ইউনিভারসিটি নামজাদা, এরই পাশে Prechristian Essene Civilizationএর অনেক খবর পাওয়া যায়, অনেক নূতন papyrus উদ্ধার হয়েছে। Three Wisemen of the East এইখানেই লুকিয়েছিলেন।

লেবানন থেকে জুরিখ, জুরিখ থেকে প্রাহা, প্রাহা থেকে লণ্ডন, আকাশপথে পরিক্রমার শেষ তিন লাফ। সুইজারল্যাণ্ডের কথা বহু বার বহু লোকে বলেছে, রূপসীর হাস্য ও লাস্যের গল্প অনেক শুনেছি অতএব পুনরুক্তির কোনো প্রয়োজনই নেই। প্রাহা বা প্রাগ্ যে কমিউনিস্ট শহর সেটা শুধু পাশপোর্টের একটু বিশদ পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুতে বোঝা যায় না। বিকাল নাগাদ পৌছান গেল লণ্ডনে—উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মুকুটমণি। আজ তার সাম্রাজ্য ছুটে গেছে, রাজ্যও স্বপ্ন সমু টুটে গেছে। কিন্তু ইংরাজকে দেখে মনে হয় না সে শুধু স্মৃতিভারে পড়ে আছে। মার সে খেয়েছে, তার আত্মাভিমানে ঘা লেগেছে, তার খাবারের থলিতে টান পড়েছে, সে কসে কোমরের কসি লাগিয়েছে কিন্তু সে মরে নি। সে সযতনে লালন করে চলেছে তার ঐতিহ্যকে, তার কৃষ্টির জলদর্চ্চিশিখাকে। যাও তার লণ্ডন টাওয়ারে, যাও তার ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, যাও তার আর্ট গ্যালারিতে—সংগ্রহ অন্যত্রও দেখেছি; কিন্তু ঠিক এরকমভাবে সমগ্রতার রূপ নিয়ে মনকে স্পর্শ করে নি। নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে টটেনহামকোর্ট রোড হয়ে গ্রেট রাসেল স্ট্রীটে যখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তখন সত্যি বলতে কি তেমন উৎসাহ জমে নি—কেমন যেন একটি পুরানো পুরানো ভাব—মনে রাখতে হবে আমি তখন সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত। ভেতরে ঢুকে কিন্তু চোখ জুড়িয়ে গেল, মন বললে—বহুদিনের খোরাক্ পেলাম—। ইজিপ্ট, অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীক রোমান সভ্যতার কত অপূর্ব নিদর্শন। মিশরসম্রাট দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের বিরাট মূর্তি আর গ্রীক Centaursদের এর মূর্তিগুলি মনে হয় অপূর্ব যেমন আসুর বানিপালের শিকারের খোদিত ছবিগুলি। ধর্মবিষয়ে ও নাটক বিষয়ে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নিদর্শন The Shabaka Stone এই ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই আছে। এখানে মেম্ফিসের দেবতা "টা"কে সব অস্তিত্বের মূল বলে বলা হয়েছে—'সর্বকারণ কারণং'। এইটি খ্রীঃ পূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বের প্যাপাইরাসের একটি প্রস্তর

অনুলিপি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে পরে লিখব। ব্লুমসবেরীর এই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সব ইতিহাসভক্তদের এক পবিত্র তীর্থস্থান। শুধু ইতিহাসভক্তদেরই দোষ দিই কেন। আর্টের দরদীদের কাছে লিওনার্ডো দ্যা ভিঞ্চির 'The Virgin of the Rock' বা র‍্যাফেলের 'Crucifixion' বা মুরিলোর 'Two Trinities' কি দর্শনীয় নয়! আমার ইতিহাসপ্রবণ মন শুধু 'Bridge of Sighs' দেখেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নি ম্যাডাম টুসোর মডেল দেখেই চমৎকৃত হয় নি, লণ্ডনের মনকে খুঁজতে চেয়েছিল। ভারতের অন্য সব অধিবাসীর চেয়ে বাঙালীর সঙ্গেই ইংরাজের বোধ হয় ঘনিষ্ঠ নাড়ীর সম্পর্ক। হয়তো তার কারণের কিছুটা ঐতিহাসিক। যে দিন সে সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে এসে নামল তমালতালীবনরাজিনীলা শ্যামলার কূলে সে দিন বাঙালীই গঙ্গোদকে তাকে চুপি চুপি বরণ করে নিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ বলতে বাঙালী বুঝত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার quintessence-কে। পশ্চিমের দুর্বার স্রোতের ধাক্কা কাটিয়ে যে সমাজ জাগরিত হয় শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলা যেতে পারে 'a society electric with thought and loaded to the brim with passion'. ইংলণ্ডের বার্ক মিল বেন্থাম, শেলী শেক্সপিয়ার তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে, তার বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য তার মানস অভিব্যক্তিকে সমৃদ্ধ করেছে।

দু দিন পরে অতলান্তিক পার হয়ে আইসল্যাণ্ডের কোল ঘেঁসে কানাডার উপর দিয়ে যখন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শহর নিউ ইয়র্কে পৌঁছান গেল তখন মনে হল এই ত গজমোতি হার গলায় নগরীশ্রেষ্ঠা সুন্দরী রূপসী—সামনে সাগরের খাড়ি, দুই দিকে দুই নদী—পুব ও পশ্চিমে তারই মাঝে গগনচুম্বী প্রাসাদে ভরা ম্যানহাটান্ দ্বীপের লিবার্টি মূর্তি যেন Walt Whitman-এর ভাষায় ডেকে বলছে :—

I hear America singing, the varied carols, I hear.

সেই সকলের মিলিত কণ্ঠের কলধ্বনিই আমেরিকার বৈশিষ্ট্য। গুরুগম্ভীরভাবে ইংরাজকে গোঁফচুমরে মাথা নেড়ে বলতে শুনেছি যে আমেরিকা—Immature অর্থাৎ সাবালকত্বের গাম্ভীর্যে এসে পৌঁছায় নি। তাদের হৈহুল্লোড়, তাদের টেলিভিসনের quizz competition, তাদের chewing gum-এর প্রতি আসক্তি, তাদের ছেলেমানুষী দেখলে হঠাৎ একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে আমেরিকা বুঝি এখনও কচি ও কাঁচাই আছে। অনেকে বলেন, ফ্রান্স যদি বা হয় একটা দেশ, ইংলণ্ড যদি বা হয় একটা

মেক্সিকোর যুদ্ধের গল্প তোলেন (Mexican Surrender), টেক্সাসের তৈলখনি, ফিলিপাইন, ফ্লোরিডা, আলাস্কা, হনোললু, মনরোনীতি, কালিফোর্নিয়ায় স্বর্ণ অভিযান এই সবের দোহাই দেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমেরিকার ইতিহাসে এই ১৭৫ বছরের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন, এমন সব লোক যারা বিশ্বের গণ্য মান্য বরেণ্যদের শীর্ষস্থানীয়। ওয়াশিংটন, লিঙ্কন, উড্রো উইলসন্, রুজভেল্টই নন জেফারসন, টম পেন, প্যাট্রিক হেন্‌রী, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এরাঁও। রাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্সন, হেনরী ডেভিড থুরো, ওয়াল্ট হুইটম্যান, লংফেলো, এডগার এলান্ পোকে যেমন স্মরণ করব, তেমনি শুনব, মেয়োব্রাদার্স, ওপেনহিমার, হুইটনি, হেমিংওয়ের কথা। ফোর্ড রকফেলার কার্নেগী ত আছেনই। পল রবসন্, জর্জ ওয়াশিংটন্ কার্ভার, ডাঃ বুচম্যান, হেলেন কেলার, বুকার ওয়াশিংটনও আমাদের নমস্য। তাছাড়া কত শত মনস্বী তপস্বী সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক আর্টিস্ট প্রতিদিন সভ্যতার স্রোতকে এগিয়ে দিচ্ছেন। কজনই বা জানতো যে এই ভারতবর্ষেরই এক গ্রন্থাগারে (বরোদায়) নব্বই বছর পূর্বে মেলভিল ডিউই নামে এক নিষ্ঠাবান গ্রন্থাগারিক জ্ঞানের তপস্যায় দিন কাটিয়েছেন। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী রামদুলাল দেকে সততার নিদর্শন স্বরূপ গিলবার্ট স্টুয়ার্ট কর্তৃক অঙ্কিত একটি জর্জ ওয়াশিংটনের ছবি উপহার দিয়েছিলেন তাঁর আমেরিকান বন্ধুরা একশো পঁচিশ বছর আগে। যখন কংগ্রেসের লাইব্রেরীতে পড়ছিলাম "We mutually pledge to each other our fortunes, our sacred honour, our lives" তখন ভাবলাম এই দলিল সই করতেই অসুস্থ সিজার রডনী ৮০ মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিলেন ঝড় জল ঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে 'ডেলাওয়ার ডেলিগেশনে' ভোট দেবার জন্য। 'Give me Liberty or give me death" প্যাট্রিক হেনরীর এই কথা আমেরিকার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। টম কাকার কুটীর সত্যই যুগান্তকারী বই। এবাহাম লিঙ্কনের কথা স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক দেশের মানুষই সাদরে আজও পড়ে। আজও পড়ে রুজভেল্টের Four freedom-এর কথা। শুধুই বলবার কইবার থাকবার স্বাধীনতা নয়, অভাব থেকে মুক্তি, ভয় থেকে মুক্তিও চাই।

এই মানসমহিমা গড়ে তুলেছিল যারা তাদের মধ্যে আদর্শবাদী নৈষ্ঠিক পন্থীদের প্রভাব যারা May flowerএ দুলতে দুলতে মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল ভগবানের নাম নিয়ে, কম নয়। Boston Brahminsদের কথা আমরা শুনি—Cabot, Lodge, Lowells, Adamsএর দল। এদের সম্বন্ধে বলা হয়—

The Lowells talk only to Cabots and Cabots to God. গল্প পড়লাম এই সে-দিনেও বোস্টনের এক বড় publisher একটি উপন্যাস ছাপবে ঠিক করেছিলেন। বইটি খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশিতও হয়েছিল কিন্তু সমগ্র বইটা প্রকাশিত হল না কারণ সেখানে একটি মেয়ের চরিত্রে অবৈধ প্রণয়ের ইঙ্গিত আছে। দ্বিতীয় স্তরের লোক যারা এসেছিল তারা ছিল ভাগ্যান্বেষীর দল,—এদের মধ্যে ছিল—ruggedness আর doggedness আর spirit of adventure. তৃতীয় স্তরের লোকরাও এদেরি দলের—ভ্যাগাবণ্ডের দল—I go West এদেরি মন্ত্র। বহুদিন পূর্বে লর্ড ব্রাইস্ উক্তি করেছিলেন, "The West may be called the most distinctly American part of America, because the points in which it differs from the East are the points in which America differs from Europe." এই উক্তি আজও কিছুটা সত্য। এদেরই আমরা Colonials বলি—সারা দেশটাকে এরা চষে ফেলছে—সুজলা, সুফলা শুধু নয় শস্যশ্যামলা ত বটেই স্বর্ণপ্রসবিনী। দেশটা কত বড় তা আমাদের ধারণাই নেই। নিউ ইয়র্ক থেকে স্যানফ্রানসিস্কো তু হাজার মাইল—কানাডার প্রান্ত থেকে টেক্সাস তিন হাজার মাইল আর কি অজস্র প্রাকৃতিক দান—কয়লা, তেল, লোহা, তামা, তুলো, কাঠ, অন্যান্য অরণ্যজ সম্পদ নয়—জলবিদ্যুতের scope অসীম, বিশেষ করে Pacific coastএ। ১২০ বিলিয়ান্ K. W. H. বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে সেখানে। টেনিসিভ্যালীর ইতিহাস ও উপন্যাসের কাহিনীর সামিল। রুজভেল্টের New Deal থেকে উদ্ভূত এই রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা Private vs. State capitalism নিয়ে যে তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল তার জের এখনও মেটে নি। মিসৌরী ভ্যালী অথরিটি নিয়ে সেই বাদানুবাদ আজও চলছে—কানাডা ও আমেরিকার সীমারেখায় অবস্থিত বিরাট St. Laurence নদীর উন্নয়নও কত দিন আটকে ছিল—আজ সেখানকার বিরাট কাজ আরম্ভ হয়েছে। চিকাগো শহর আর মিচিগান হ্রদের ধারে আপন মনে বিরহিণীর সুর গাইবে না—সে হবে যুক্ত মহাসাগরের সঙ্গে—বিরাট অর্ণবপোত এসে বেঁধে দেবে তার অঞ্চলে মণিমাণিক্য স্বর্ণ বৈদূর্যে। আমাদের দেশে আমরা যে ভাকরা, হীরাকুদ, দামোদর, নাগার্জুন সাগরের কথা বলি, বহুমুখী (multipurpose) পরিকল্পনার কথা শোনাই—সেচের জল পাওয়া যাবে, বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে, বন্যা রোধ হবে, নৌবাহী খাল দিয়ে পণ্য আসবে, দেশের শ্রী সমৃদ্ধি বাড়বে, স্বাস্থ্যকর জায়গা গড়ে উঠবে, এককথায় অন্ন হবে বহু—তার প্রথম বৃহৎভাবে

সূচনা এই দেশেই। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে এই সব পরিকল্পনার বিরাটত্ব। গ্র্যাণ্ড কুলী ড্যামের কথাই ধরুন—এই জলাধারে জল ধরে ৪½ হাজার কোটী কিউবিক ফুট, খরচ হয়েছে দুই শত মিলিয়ন ডলার। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় শুনলে যে, সারা পৃথিবীতে যত মোটর চলে তার পাঁচ ভাগের চার ভাগ চলে এখানে—বড় বড় শহরে রাস্তায় মোটর 'পার্ক' করবার জায়গা পাওয়া যায় না, সমগ্র পৃথিবীর অর্ধেক টেলিফোন এখানে বাজে—কসমেটিকে খরচা হয় দশ কোটি ডলার। আমেরিকান Economyর মূল কথা হচ্ছে—production বাড়িয়ে যাও, ভোগ্য দ্রব্য (consumer goods) বাড়িয়ে যাও, তাদের 'revolving credit system' মার্কেটিংএর মূল মন্ত্র। যে-কোনো জিনিস তুমি চাও—জামাকাপড়, বাড়ি, মোটর, ফার্নিচার, টেলিভিসন, রেডিও, রেফ্রিজারেটার, বিদেশে বেড়াতে যাওয়া, ফার্ম কেনা—সবই 'Easy instalment system'—সইটি কর, 'চার্জ একাউণ্ট' খোল, 'ব্যাঙ্কের রেফারেন্স' দাও না হয় কোথায় কাজ বা কী কর বল তুমি বাড়িতে পৌঁছানর আগেই জিনিস পৌঁছে গেছে তোমার বাড়িতে। কিস্তীখেলাপ হয় না যে তা নয় কিছু কিছু টাকাও ডোবে কিন্তু সাধারণতঃ এই revolving credit-এই আমেরিকার Internal Economy চলেছে।

এদের সমাজে পুত্রকন্যারা সাবালকত্বের সঙ্গে সঙ্গেই পিতৃমাতৃ নিরপেক্ষ জীবন গড়ে তোলে—স্বাধীন জীবিকার্জনে প্রস্তুত হয়। অনেকক্ষেত্রেই সম্পর্কও হয়ে ওঠে ক্ষীণ। ওয়াশিংটনে যে হোটেলে ছিলাম সেখানে একদিন আমি কয়েকখানি চিঠি পেয়ে লাউঞ্জে বসে খুব খুশি মনেই পড়ছিলাম—একটি বৃদ্ধা মহিলা দেখছিলেন—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন দেশের চিঠি বুঝি—আমি বললাম—হ্যাঁ, আমার মেয়ের চিঠি—আমার দিকে চেয়ে বললেন—মেয়ে—বিয়ে হয়েছে—আমি বললাম হ্যাঁ।—তিনি ম্লান হেসে বললেন—এই দেখ—তুমি কদিনের জন্যই বা এসেছ, সুস্থ সবল তবু তোমার মেয়ে তোমায় চিঠি দেয়, আর আমাদের—সেই ক্রীস্টমাসে হয়তো একটা কার্ড পাব আমি ভাল কি মন্দ আছি তাও জানতে চায় না। হয়তো ওর ব্যাপারটা Exceptional কিন্তু বহু বাপ-মাকে দেখেছি কি মমতা ও স্নেহ দিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করছেন। অবশ্য এখানে শিক্ষার বিষয়ে সুবিধা আছে। বারো বছর পর্যন্ত বয়সের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ফ্রি—তাছাড়া সরকার থেকে আছে নানারকমের সাহায্য, Stipend, Scholarship, Free lunch, Free books প্রভৃতি, কলেজের ছুটিতে অনেক ছাত্রছাত্রীই নিজের খরচ চালাবার জন্য বাড়তি কাজ করে—বাসন মেজে, ঘর

ধুয়ে ঝাঁট দিয়ে, গ্যারেজ মুছে চালিয়ে নেন। একটি ভদ্রলোকের কথা আমি জানি তিনি এখন ভার্জিনিয়ার উকীল। বাপ মারা গিয়েছিলেন—মা ছিলেন বেঁচে, মায়ের হাতে ছিল প্রচুর টাকা। কিন্তু কলেজে পড়তে এলেন একটি সর্তে—মা দেবেন টাকা ধার। তিনি খেটে শোধ করবেন—পড়তে পড়তেই অর্ধেক শোধ করেছিলেন তিনি—মায়ের কোন আপত্তি ত ছিলই না, বরং সমর্থনই ছিল যদিও একমাত্র সন্তান এবং পুনরায় বিবাহও করেন নি তিনি। আমেরিকায় মেয়েদের হাতেই দেশের ৬০ ভাগ সম্পত্তি।

সব দেশে যেমন এখানেও তেমনি। একদিকে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি আত্মোৎসর্গের ভূরি ভূরি ইতিহাস আর এক দিকে তেমনি ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ, ব্যক্তির ভোগ, লোভ, লালসা, অত্যাচার, অনাচার। Gangsterism, Bootlegging, Juvenile delinquency, Sex and sensation, Rock and roll প্রভৃতি কত কথাই ত আমরা শুনি। Reno ও Lasvegasএর কথা সবাই পড়ি। কিন্তু জাতির মেরুদণ্ডে তার ফলের প্রভাব লেগেছে কি এইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। চিকাগোকে বলা হয়েছে 'a great beast of a city that crouches like a blue black panther' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা হচ্ছে 'path from tenement to electric chair is paved with Society's inattentions' এবং এইখানেই 'Here the son watches his own mother get hooked and degenerate.' কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস এরা হারায়নি সেইটিই হচ্ছে বড় কথা। "Nobility and love may flower whenever the seeds are sown." এদেরি একটি State Libraryতে উৎকীর্ণ আছে, "Give me men to match my mountains." এমন মানুষ দাও, যারা হিমালয়ের মত খাড়া দাঁড়িয়ে থাকবে গগনস্পর্শী উত্তুঙ্গী মন নিয়ে। সেদিন নায়েগ্রার কাছে বাফেলো বলে একটি প্রসিদ্ধ সহরে Convention বসল—বিষয়বস্তু কী—না—"Why is the U. S. most marrying and divorcing nation"—কেন সত্যই কি স্ত্রীপুরুষের মাঝে Emotional Instability বেড়েছে না। স্বামীস্ত্রী দু জনেই জীবনকে অত্যন্ত Individual দিক থেকে দেখতে আরম্ভ করেছেন। স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশই কি পারিবারিক সম্বন্ধকে ক্ষণভঙ্গুর করে তুলে নূতন পৌত্তলিকতার সৃষ্টি করছে। এই বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েরা সমাজ-জীবনে দস্তুরমত এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য বহু প্রতিষ্ঠান ও বহু স্বামী স্ত্রী পুত্রকন্যা adopt করছেন। এটা প্রায় একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। আর-এক

দিক থেকে এদের পারিবারিক সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। জন্মশাসন কমে গেছে—পুত্র কন্যার সংখ্যা বাড়ছে, বিবাহোপযোগী বয়স কমছে। অনেক স্থলেই লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ১৮।১৯ বছর বয়সেই মেয়েরা সন্তানবতী—২২।২৩-এ দু-তিনটি সন্তানের জননী। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করবার বহু বয়স্কলোকের স্ত্রী অল্প বয়স্কা। এই স্তরে বিবাহ কি ক্রমশই রোমান্টিক মোহ কাটিয়ে Business relationshipএ দাঁড়াচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র—একটা প্রয়োজনের, একটা লীলার। একটা বাইরের তাগিদ, একটা ভিতরের—নারী আমাদের এই দুই ক্ষুধাই মেটায়। কিন্তু আসলে সে হ্লাদিনী, প্রাণতোষিণী—তাই সে শুধু জীবের জন্মদাত্রী নয়, ধাত্রীও বটে,—সমাজ বা রাষ্ট্র যতই ভার নিক্ তার আজকের দিনে কাজটা করে মায়েরাই, সে আসল মা হক আর ভাড়াটে মা হক। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীতে এই কথাটা ফুটেছে। আমেরিকা সম্বন্ধে একথাটা প্রায় প্রযুজ্য বলেই উদ্ধৃত করছি "যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী, ভুলেছে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই। তাই দরকার নারীকে, নন্দিনীকে যে প্রাণের বেগ আনবে যন্ত্রের উপর, যে ভোগবতীকে করবে সুরধুনী, মাংসের হাটে বেচাকেনায় পুরুষকে করবে না স্বাধিকার প্রমত্ত, নিজে হবে না রসহীনা।"

পৃথিবীর ইতিহাসে আমেরিকা আবিষ্কারের কথা একটা অদ্ভুত কাহিনী। সভ্যতার মোড় ফিরেছিল একটা বিরাট ধাক্কা খেয়ে। যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউরোপের মানুষ স্বপ্ন দেখেছে পূবদেশের, অপার ঐশ্বর্যের—তারা আসবে ভারতে, যাবে দ্বীপময় সমুদ্রে—নিয়ে আসবে শুক্তি মুক্তা সুগন্ধি মশলা সোনা রূপো। সে তৃষিত নয়নে চেয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে, লুব্ধ হয়েছে। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দারের দিন থেকে আজ পর্যন্ত সে ভুলতে পারে নি Ormuz ও Indএর কথা, তার অলৌকিক কাহিনী। মেডিটারেনিয়ানের বুকে পাল তুলে যেতে যেতে সে স্বপ্ন দেখেছে কবে ভারতবর্ষে আসবে। ক্রীটের দ্বীপে, গ্রীসের উপদ্বীপে, থিবস্ মেম্ফিসের মন্দিরে সিরামিস ক্লিয়োপাট্রার বিলাসবাসরে ভারতীয় হীরামুক্তা মাণিক্যের ইন্দ্রধনুচ্ছটা তাদের মুগ্ধ করেছে। মেগাস্থিনিস থেকে মার্কোপোলো সবাই সরব হয়ে খবর পরিবেশন করেছেন। I go Eastই তাদের নিয়ে গেল এই Westএ। কলম্বাস ত ভেবেই ছিলেন যে

তিনি ভারতেই পৌঁচেছেন। আজও Red Indian নামের সঙ্গে ভারতানুসন্ধানের চিহ্ন বর্তমান।

আমেরিকাকে জানতে হলে তার সাধারণ মানুষকেই জানতে হয়—সবাই গল্পে, আমুদে—Uncle Sam সত্যিই শ্যামখুড়ো—বাসে হোক্, ট্যাক্সীতে হোক্, প্লেনে হোক্ এক মুহূর্তে আলাপ হয়ে যাবে—হাঁড়ির খবর বলে দেবে ও নেবে —কোন ঢাকাঢাকি নেই। এই বালসুলভ চপলতা ওদের সাহচর্যকে মাধুর্যমণ্ডিত করে। একটা গল্প বলি, প্লেনে আসছি নিউ ইয়র্ক থেকে আমস্টারডামে। পাশের সিটে সহযাত্রী ছিলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। এক মিনিটে আলাপ করে নিলেন—তিন মিনিট যেতে না যেতেই ভদ্রলোক তাঁর পারিবারিক কথা পর্যন্ত এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশীকে বলে চলেছেন—তিনি কে, কী করেন, কোথায় থাকেন, তার কর্মস্থল—তিনি চলেছেন ইউরোপে একটি সত্যিকার তন্বীশ্যামাপক্কবিম্বাধরোষ্ঠীকে সংগ্রহ করবার আশায়। ভদ্রলোক বিদ্বান বুদ্ধিমান অর্থবান। অর্থোপার্জনে মন দিয়েছিলেন এতদিন, এখন দেখছেন পলাতক যৌবনকে বেঁধে রাখতে হলে একটি পলাতকা উদ্ভিন্নযৌবনাকে ধরা দরকার—মন তাই বাসা বাঁধবার জন্য আকুল, কিন্তু কোন আতাম্রকুন্তলা আনীললোচনা হরিণচকিতনয়নাকে তাঁর পছন্দ নয়। তিনি যেমনভাবে প্রত্যেক দেশের মেয়েদের বিশদ গুণ বর্ণনা আরম্ভ করলেন···কেউ cold, কেউ domineering, কেউ flirt, তখন মনে পড়ে গেল আমাদের দেশের উদ্ভট কাব্যের কথাগুলো বাচি শ্রীমাথুরীনাং, জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে, দন্তে গৌড়াঙ্গনানাঃ······ইত্যাদি। তিনি বলেছেন স্পেনে শুনেছেন সেখানের মহিলাদের মধ্যে প্যাশনের সঙ্গে একটা oriental স্থিতিস্থাপকতার সুর আছে অর্থাৎ বিবাহ করলে তারা ভাবে যে একে যাবজ্জীবন টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত—কোন কারণে না নিয়ে যেতে পারলে সে আলাদা কথা—কিন্তু আজ বিবাহ কর, কাল রেণোয় চলো তা নয়। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে তিনি যে প্রিয়ার সন্ধানে চলেছেন এত কাব্যেই পড়া যায়। তিনি বললেন—তোমাদের দেশের মত Arranged marriage is the best. আমি বললাম—আমরা ত এখন সে arrangement ভেঙে দিচ্ছি। তিনি বললেন—ভুল করছো—আচ্ছা সত্যি করে বল দিকিন্, তোমারও বয়স হয়েছে, আমারও হয়েছে—প্রেম ভালবাসা এসবগুলো একটা Emotional Imbalance—Endocrinal disturbance কিনা—ওটা ঐ Teenage-এই চলে—না হয় চলে Exhibitionরূপে—আমাদের Sea Beachএ

হবে। জানি এ ছবি আজও দুর্লভ নয়, হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে অজ পাড়াগাঁয়ে, সিনেমার সেলুলয়েড পর্দায় আর আমাদের মত গতায়ু প্রবীণ মনে কিন্তু এর সার্থকতা শুধু প্রথাকে টেনে নিয়ে যাওয়ায় নয়, এর নূতন মূল্যায়নে, নব রূপায়ণে। সেইখানেই ঠেকেছি আমরা, অচলায়তনের দুর্গ ভেদ হয় নি, দুর্গেশনন্দিনীকে পাওয়া যায় নি, যে নন্দিনী হ্লাদিনী, আনন্দদায়িনী।

আমেরিকার এই প্রথম ভোরটিকে আমি মনে মনে অভিবাদন জানালাম— কালোর অতল ভেদ করে আলোর আগমনীর এই দ্বিধার ছন্দটি ভারী ভাল লাগল মনে, বলতে ইচ্ছা করছিল—হে মাধবী দ্বিধা কেন—অরুণবরণ তিমিরহরণ নামছেন, তাঁকে বরণ করে নাও, দাও তোমার গলার মালাটি পরিয়ে। অবশ্য এইসব অতি আলোকিত শহরে আমাদের পল্লীগ্রামের পরিচিত সেই আঁধারের অতি নিবিড় রূপটি ধরা পড়ে না, তবু তন্দ্রাহীনা তামসীকে যে মিশতেই হবে কনকোজ্জ্বলা উষসীর পাশে, গঙ্গা-যমুনা যেমন মেশে। জীবনের ছন্দের এই দ্বৈত রূপই যে একমাত্র সত্য।

সূর্য ওঠেন প্রতিদিন, প্রতিটি যুগে, প্রতি দেশে, প্রতি সকালে, হিমবান মরুর দেশ ছাড়া। গঙ্গার তীরে যাঁকে দেখেছি পূর্বাস্য হয়ে, ভল্গার তীরেও যে দেখি তাঁর মহান আবির্ভাব। দুঃখঝঞ্ঝাময় জীবনে এই আলোর প্রতীককে গ্রহণ করাই ত মানুষের সবচেয়ে বড় তপস্যা। প্রকৃতির আইনে প্রতি প্রভাতে সূর্যোদয় একটি অতি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু একে নিয়েই যুগে যুগে কবি উঠেছেন মেতে, সাধক বসেছেন ধ্যানে, বিজ্ঞানী নিয়েছেন বীক্ষণযন্ত্র, গাণিতিক করেছেন গণনা। ইনিই তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং পরং পাবকং, ভাসকং ভাসকানাং —অথচ ন ভূমির্নচাপো ন বহ্নির্ন বায়ু, ন চ আকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।

এ কী দীপ্যমান মহা অহংকার। নীলনদের কূলে এ্যাটন 'রা' যে সুর ধরিয়ে দিলেন, পঞ্চনদীর তীরে উষার উদয়ে বিস্ময়ে অনবগুণ্ঠিত বৈদিক ঋষিদের মন সেই তান লয় মানেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—কোন্ বরণীয় তেজকে ধ্যান করব, কার চরণধূলার তলে মাথা নত হবে—কোন্ পূষণ অপাবৃত করবেন তাঁর চরমরূপ, 'গুহ্যতম রহস্য', তাঁর 'পরমং বচঃ' যিনি অণুর অণু মহতের মহৎ। সেই সন্ধানেই ত আজ বৈজ্ঞানিকের রথ ছুটেছে মহা আকাশের পথে পথে, মহাশূন্যের নীলিমায়, দুগ্ধফেনশুভ্র নীহারিকার পুঞ্জে পুঞ্জে, আলো-আঁধারের কুঞ্জবিতানে। আজ স্পুটনিক ছুটছে, পাইওনীয়র ছুটছে, রকেটবাহী অণু ছুটছে—আণবিক দিনে মানুষ বিষ্ণুর সৈনিকরা।

আমি যে দেশে এসে গতকাল পৌঁছলাম, শুনেছি সে দেশে কবির ভাষায় বলতে গেলে কুবেরের সিংহাসন পাকা—সেখানে নাকি বিজ্ঞান ঘোষণা করে যন্ত্রের নিয়মই বিশ্বের নিয়ম—বাহ্য সিদ্ধিলাভের বাহিরে কোনো নিত্য সত্য নেই—সেখানে প্রতিযোগিতার উগ্রতা সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে—লোভ-বৃত্তি ভদ্রবেশে পেয়েছে সম্মান। কিন্তু প্রশ্ন করি সবদেশের ইতিহাসেই কি এই তথ্য ফুটে ওঠে নি—এমনকি আমাদের তথাকথিত বুদ্ধচৈতন্য গান্ধীর দেশেও অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষেও। সর্বত্রই লোভী আছে, লুব্ধতা আছে, মহাজনের রাজত্ব আছে, মুনাফার বাহন আছে। মানব সমাজ ত একটা মস্ত বড় জঙ্গল বিশেষ, সেখানে লুব্ধ পশুরা যেমন আছে, কাঁটা গাছ যেমন আছে, লতানো পরভৃতিকা যেমন আছে, তেমনি আছে বনস্পতির দল। আমেরিকায় এসে এই সত্যটাই আমার সবচেয়ে বড় হয়ে মনে লেগেছে। পূব আর পশ্চিম নিয়ে এইযে অধ্যাত্মবাদী আর জড়বাদী বলে দলাদলির দলিল লেখা হয় এর চেয়ে অবাস্তর বহ্বাস্ফোট আর কিছুই নেই। একদিকে যেমন আস্ফালন চলছে আমি জ্ঞানী, আমি বিজ্ঞানী, আমার যন্ত্র আছে, আমার অস্ত্র আছে, নিকুম্ভিলার যজ্ঞাগারে শস্ত্রসম্ভার আছে, আমার কলা আছে, কৌশল আছে, অর্থ আছে, আমি পৃথিবীর হৃদপিণ্ডকে উপড়ে আনতে পারি, যেতে পারি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে চন্দ্রলোকে মঙ্গললোকে, তেমনি আর-এক দিকে আস্ফালন আমি অধ্যাত্মমানসের ধূম্রলোকের মায়াজালে বাস করি, আমি ত্যাগী, আমি কামিনী-কাঞ্চনকে পায়ে দলেছি, আমি জেনেছি তাঁকে যিনি অবাঙমানস গোচর, যিনি মহান্ত পুরুষ, আমি ধ্যানের নৈঃশব্দে ডুবে যেতে পারি। যাঁরা এসব কথা বলেন (অবশ্য প্রকৃত মরমীরা কী এ-দেশে কী ও-দেশে বলেন না) তাদেরই সবিনয়ে সভয়ে নিবেদন করব এসব আস্ফালন হচ্ছে এক ধরণের অহঙ্কারের অজীর্ণতা। মানুষের ধর্ম হচ্ছে সব নিয়ে, তার প্রকাশ বহুর মধ্যে, তার সম্প্রসারণ প্রতিটি সরণীতে। যে কাজই সে করুক সে কাজ যদি সে ভালভাবে করে, অকৃপণভাবে অসংশয়িতচিত্তে, তবে তার মহিমা থেকে সে বঞ্চিত হয় না, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারে আমি আছি, জৈবিক প্রয়োজনে আছি, ব্যক্তিগত অভিরুচিতে আছি, বৈষয়িক লাভে আছি, সমষ্টিগত আনন্দে আছি, প্রকৃতির লাখেরাজ দেবত্র ভূমিতে আছি, আর আছি নিজের মনের অপরিসীম গভীরতায়, সবার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে। এই চিরকালের মানুষই বলতে পারে, কি এ দেশে কি ও দেশে যে অহং ব্রহ্মাস্মি—সনাতন ধ্যান ধারণার মধ্যেই ত তিনি ব্যক্ত নন—তার

হচ্ছে—*Reconstruction of Humanity* (মানব সমাজের পুনর্গঠন)। এই পুনর্গঠন সম্ভব হবে—Creative altruismএর মধ্য দিয়ে অর্থাৎ জ্ঞান-কর্মশক্তি-মেশান যে সৃজনশীল মানবতা। এই বইটি উৎসর্গিত হয়েছে সেই মহাপ্রাণকে যিনি তাঁর মৃত্যুহীন প্রাণ মরণেরে শ্রদ্ধাসহকারে দান করে গেলেন—reverently dedicated to the deathless Mohandas K. Gandhi, যাঁর মর্ত্যজীবনের শেষ পুণ্যবাণী আরামকেই হারাম করে নি, হা রাম বলে রামনাম মণিদ্বীপের মধ্য আত্মার অজেয় অমর বাণীকেই জানিয়ে গেছে।

মনে পড়ল ছেলেবেলায় শোনা বাউলের গান—কে কাকে গুরু বলে প্রণাম করে—

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?
তোর অথিক গুরু পথিক গুরু, গুরু অগণন
গুরু যে তোর বরণ ডালা, গুরু যে তোর মরণজ্বালা
গুরু যে তোর হৃদয়ব্যথা (যে) ঝরায় দুনয়ন
কারে প্রণাম করবি মন।

না না না, আলোর ঝর্ণাধারাকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। বিছানা ছেড়ে উঠতেই হল। প্রতিদিনই ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকবার চেষ্টা করি—হেসে উঠবেন না—এ ধ্যান নয়, ধারণা নয়, স্বগত মন্ত্রোচ্চারণ নয়, যোগাভ্যাস নয়, গীতাপাঠের ভূমিকাও নয়। প্রতিদিনই এই অনভ্যাসের অর্ধচূড় শিথামোচন ব্যাপারটি মারাত্মক রকমের হাস্যকর হয়ে ওঠে। বাঁকান মন বারেবারে বলে—না না না। চেতনায় রাঙা হয়ে ওঠে না আমার মনের পান্না, শুনি না, হাঁ হাঁ হাঁ। হাঁ আর না-র দ্বন্দ্ব এখন থাক, বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা ক্রিং ক্রিং ক্রিং। ছেদ পড়ল চিন্তায়। বেলমণ্ট্‌পাড়া থেকে ডাকছেন নলিনী চক্রবর্তী। পরশুরামের ভাষায় ইনি পুং অর্থাৎ প্রিয় বান্ধবী নন প্রিয় বন্ধু। আমেরিকা প্রবাসী এই ভদ্রলোকটি সদালাপী মিষ্টভাষী ও কর্মকুশল—সেই ধরনের বান্ধব যিনি শুধু উৎসবের আসরই সরগরম করেন না, দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানেও যিনি বন্ধুত্বের সম্মান দিতে পশ্চাদপদ হবেন না। পঁচিশ বছর আগে প্যাগোডার দেশে ইংরাজের আমলে ইরাবতীর তীরে চাকরির সূত্রে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়, যেখানে 'পদ্মাসন আছে স্থির, ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন, চিরদিন'। সুজলা সুফলা চট্টলা থেকে এঁদের পরিবার পাড়ি দিয়েছিলেন পোয়ে ও প্যাগোডার দেশে—শোয়েডাগনের নিচে। The Silken East হয়তো এঁদের ধরে রাখত কিন্তু বিশ্বের ঘটনা যদি হয় প্রতি-

কূল আর মন যদি হয় ভ্রাম্যমাণ তবে সব দেশেই ঠাঁই জুটে যায়। ইনি এখন ইউনাইটেড নেশন্‌সের বিশ্বব্যাঙ্কে এক দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তিনি বললেন—করছেন কী, ছুটির দিন, (শনি রবিবারে এখানে ছুটি) চলুন বেরুনো যাক্, গাড়ি নিয়ে আসছি এক ঘণ্টার মধ্যে, সারাদিনই ঘোরা যাবে—হোটেল মোটেল কাফ্যাটেরিয়ার ত অভাব নেই—মন নেচে উঠল—ভাবছিলাম গ্রেহাউণ্ড বাসে ওয়াশিংটন দেখার একটা পাইকারী টিকিট কিনব কি-না—

বললাম—তথাস্তু, কোথায় যাবেন, ভোজনং যত্রতত্র হতেই পারে, রাত্রের জন্য শয়নং হট্টমন্দির অর্থাৎ হোটেল ত খোলাই আছে, কিন্তু মরণং পটোম্যাক তীরে নয়, ওটা গঙ্গাতীরে তারকব্রহ্মনাম শুনতে শুনতে যাবার জন্যই মুলতুবী থাক। তিনি বললেন—মাভৈ; লম্বা পাড়ি দেবো বটে কিন্তু মোটরের স্পীডটা আপনিই নিয়ন্ত্রিত হবে, কারণ আমার স্ত্রী যাচ্ছেন সঙ্গে। তাঁর এ বিষয়ে কড়া নজর। অতএব নিঃশঙ্ক হয়ে হোটেলের শীর্ষতল থেকে অবতরণ করুন।

স্নানাদি পর্ব শেষ করে নামা গেল লাউঞ্জে—লিফটে দেখি আমারি মত কাল মানুষ—নিগ্রো লিফ্‌টম্যান, বয়স সতেরো আঠারো, কচি ও কাঁচা। সাদার ভিড়ে গতকাল তাকে দেখি নি, আমার দিকে চেয়ে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বললে—গুড্‌ মর্নিং সার।

লিফ্‌টে ভাগ্যক্রমে আমি একা। হেসে মাথা নেড়ে হঠাৎ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই জবাব দিলাম—বোঁজুর মনামে। ফরাসী ভাষার ঐ দুটি একটিই আমার সম্বল—সময় বুঝে নিজের কারদানী দেখাবার জন্য দু-একটা ছাড়ি, বেনা বনে মুক্তো ছড়াবার মত। ফরাসী ভাষায় কেন জবাব দিয়েছিলাম তার সঠিক কোনো যুক্তি ছিল না। হয়তো অবচেতনে তাকে প্রথমেই বন্ধু বলে অভিহিত করব এটি আমার মনোভাবে ছিল এবং তার আন্তরিকতা আমার মনকে স্পর্শ করেছিল তাই হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল ফরাসী ভাষা। আমার মুখে ফরাসী ভাষা শুনেই হোক বা অজ্ঞতাবশতই হোক বা বিজ্ঞতার ভান দেখেই হোক সে হেসে বললে—মঁসিয়ে কি ফরাসীদেশের না এলজিরিয়ার লোক।

হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, বললাম—ধরেছ ঠিক (You have caught me right). আমি ইণ্ডিয়ার লোক।

আসবার দিন সে বলেছিল—Come again Sir (আসবেন আবার)। পুনরাগমনায়চ—

আমি জবাব দিয়েছিলাম—তুমি এসো না আমাদের দেশে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। নদী পার হলেই আর ডি. সি. নয়, অর্থাৎ জেলা কলম্বিয়া পার হয়ে আমরা খাস ভার্জিনিয়া রাজ্যে পৌঁছেছি। সুন্দর সুবিন্যস্ত সুপরিকল্পিত রাস্তা, বাড়ি ঘরদুয়ার জমিজমা। হিটলারের জার্মানী যেরকম বড় চারপাল্লা রাস্তা তৈরি করেছিল সেইরকম রাস্তা—দুই লাইন আপ—দুই লাইন ডাউন। সাঁওতাল পরগণা ছোট নাগপুরের মত উঁচুনিচু—আশেপাশে ছোট ছোট খণ্ড শৈল উঁকি দিচ্ছে। মহুয়া মাতাল তাল তমাল শাল পলাশ না থাকলেও আছে অন্য বনস্পতির দল—ঊর্ধ্বশীর্ষ শ্যামল সবুজ।

সত্যিকার আমেরিকাকে জানতে হলে রাস্তায় নামতেই হয়। নিউ ইয়র্কের ককটেললাউঞ্জে বসে বা ওয়াশিংটনের হোটেলের গদিতে গদীয়ান হয়ে জানা যায় না। যেমন জানা যায় না তার বিচিত্র মনন ধারাকে শুধু বই পড়ে বা শুধু বক্তৃতা শুনে বা টিপ্পনী কেটে। লম্বা পথ দিয়ে প্রায় ৬০ মাইল বেগে আমরা চলেছি। কবির কথা মনে পড়ে—'এ পথ গেছে কোন্ খানে গো কোন্ খানে—কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে, কোন্ দুরাশার দিকপানে'। তবু আমরা যে দিক দিয়ে চলেছি সেটা এই বিরাট মহাদেশের কতটুকু! নিউ ইয়র্কে যখন সকাল, নিশীথিনী রাত্রির স্তিমিত জীবন যখন আলোর ধারায় কল্লোলিত, তখন কালিফোর্নিয়াতে সূর্য উঠতে আরো তিনঘণ্টা দেরী। আমেরিকার বুকের উপর দিয়ে অতলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের কিনারা কোথাও কোথাও প্রায় তিন হাজার মাইল। ওরি মধ্যে সভ্যতার এক ঘূর্ণিচক্র ঘুরছে। শুধু নানা দেশ থেকেই মানুষ আসে নি—তাদের প্রত্যেকের সভ্যতার বিচিত্র রূপ ও রং নিয়ে এসেছে। কত মানুষ, তাদের কত আশা দুরাশা লোভ ভয় গৃধ্নুতা লিপ্সা বিশ্বাস আনন্দ নিয়ে এগিয়েছে, পাহাড় জঙ্গল পেরিয়েছে, মাটির সঙ্গে মিতালী করেছে, ধরিত্রীকে বুকে আঁকড়েছে, পশুপালন করে পশুপতি হয়েছে, কণ্ঠে বিষ নিয়ে নীলকণ্ঠ। তবু এদের যাত্রা থামেনি। I go West-এর জীবনধারা মিলায় নি। পথে নামলে সেই কথাই মনে পড়ে। ওয়াশিংটন থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়—দেখতে দেখতে বাল্টিমোর এসে যাবে। সমুদ্রের খাড়ির নিচে দিয়ে চলে গেছে এক বিরাট রাস্তা 'কসওয়ে'—উপরে জাহাজ, নিচে মানুষ মোটর। আরো এগিয়ে পেনিসিলভিনিয়া টার্নপাইক ধরো ফিলাডেলফিয়া নিউ ইয়র্ককে পিছনে ফেলে—তারপর নিউ জার্সি টার্ন-

পাইকে মোড় নাও—দূরে আরো দূরে চলে যাও পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। বিরাট আমেরিকার একটি ভগ্নাংশের কথাই বললাম, কারণ আমাদের অল্পস্থায়ী উপস্থিতির মধ্যে খুব বেশি ঘোরা সম্ভব হয় নি। এখানে রাস্তায় চলার একটা মোহ আছে। মোটরকার হচ্ছে আমেরিকানদের শুধু লক্ষ্মী নয় তার সভ্যতার প্রতীক। মোটর হচ্ছে শুধু তার বাহন নয়, সচিব সখি মিথও বটে—মেয়েদের ছেলেদেরও। শুক্রবারের দুপুর থেকেই পালাও পালাও। মোটরে সব গোছানো আছে, দশতলা বিশতলা থেকে নেমে পড়—এক্সিলেটারে পা দাও, গালফ্ অর্থাৎ পেট্রোল ভর্তি কর—বেরিয়ে পড় রাস্তায়—একা হোক, যুগল হোক, পার্টি করে হোক—বহুজন-হিতায় হোক, বহুজন সুখায় হোক। মসৃণ চকচকে চমৎকার পিচের বা কনক্রিটের রাস্তা—ক্লান্ত হলে আছে সস্তায় হোটেল, বলা হয় মোটেল—এখানে ওখানে ছড়িয়ে—পাহাড়ের চূড়োয়, বনের নিভৃতে, লেকের ধারে, মৃদু গুঞ্জনে গুঞ্জরিত করতে পারো তোমার অবসরের ক্ষণগুলি, ক্লান্ত দিনের শেষে রাত্রির সোহাগকে স্বপনময় করে তুলতে পার নিষ্কলঙ্ক শুভ্র শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে। সুপক্ব সুঘ্রাণ লেহ্য পেয় ভোজ্য ত আছেই, আছে টেলিভিসন রেডিয়ো ইত্যাদি। মাছ ধর, গান গাও, লাফাও, বই পড়, হৈ-হল্লা আড্ডায় মাতো, সাঁতার কাটো, প্রেমের গল্পে মশগুল হও—যার যা খুশি—কেউ কিছু বলবে না, মন্তব্য করবে না, টিপ্পনী কাটবে না—এদের বহির্জীবনে এটা একটা মস্ত বড় অঙ্গ—হয়ত গভীরতা নেই, আন্তরিকতা নেই, কিন্তু প্রাণ আছে, উদ্দামতা আছে।

পেনিসিলভিনিয়াকে লাল মাটির দেশ বলা যেতে পারে। নিউ জার্সীতে ধরিত্রী রং বদলেছেন, পীতবরণ দেখা দিয়েছেন বালির আস্তরণ ফুঁড়ে, ওহিয়োতে তিনি ঘনশ্যাম, আর ইলিনিয়সে মা আমার কালবরণী। আরো দূরে আছে আরিজোনার রঙীন মরুপ্রান্তর, গ্র্যাণ্ড কেনিয়নের ধ্যানগম্ভীর রূপ, কলোরাডোর মর্মর ধারা, সাউথ ড্যাকেটায় পাহাড়ের উপরে গণতন্ত্রের মন্দির (The Shrine of Democracy) বহতা নদী মিসিসিপি-মিসৌরীর দেশ, কনকবরণী কালিফোর্নিয়া—লস্ এঞ্জেলস্, বেভারলি-হিলের ঐশ্বর্য, স্যানফ্রানসিস্কোর মহিমা, তার লম্বার্ড-স্ট্রীট্, চিকাগো ডেট্রয়টের পণ্যসম্ভার, নায়েগ্রার জলপ্রপাত, ফ্লোরিডার রৌদ্র-ধৌত সমুদ্রতট। সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়, হয়ও নি—কোথাও আমাদের দেশের মত গা পুড়ে যাচ্ছে গরমে, কোথাও বরফের হিমেল হাওয়া, কোথাও ধু ধু প্রেয়ারি বা প্রান্তর, কোথাও শ্যামল বনানী। ওয়াশিংটনের কাছে পিঠে

॥ চৌত্রিশ

আমি তখন আমেরিকায়। একটি বৃষ্টিসজল আঁধার চপল সন্ধ্যা। ওয়াশিংটন থেকে আড়াই শো মাইল দূরে অতলান্তিকের উপকূলে সমুদ্র-নিলয়ে উইকএণ্ডে বেড়াতে চলেছি। সপ্তাহ শেষের বিকেল, চৈত্ররাঙা সর্বনাশের রাত্রি নয়—দলে দলে জোড়ায় জোড়ায় হংসমিথুনের মত মানুষ চলেছে শহর থেকে দূরে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে। বারোইয়ারীর দল চলেছে চকচকে, মসৃণ পিচঢালা চারলাইনি পথে। বাল্টিমোর, ফিলাডেলফিয়া পিছনে পড়ে রইল,—শহর, শহরতলি, গ্রাম, জনপদ—উন্মুক্ত প্রান্তর পেরিয়ে, হরিৎ শস্যক্ষেত্র পার হয়ে ষাট মাইল স্পীডে মোটর ছুটেছে। দূরে একদিকে নীলাঞ্জন আকাশে মেঘের সঙ্গে নীলপ্রভ পাহাড়ের কোলাকুলি, লুকোচুরি, আর-এক দিকে মহাসিন্ধু থেকে সঙ্গীত ভেসে আসছে—উন্মত্ত কলগর্জন, অশ্রান্ত অশ্রুত ভাষায়। হঠাৎ এক যৌথ খামারের ধারে একটি মোটেলের (অর্থাৎ যেসব পান্থনিবাসে সস্তায় সব সময়ে একক বা সবান্ধব বা সবান্ধবী বিনাপ্রশ্নে সারথিবিহীন রথকে রেখে দিন বা রাত কাটান যায়) আঙিনায় দেখি নাচের সরস আসর জমেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘমেদুর অম্বরে দু-একটি তারার উদয়। একদল তরুণ-তরুণী সদ্যঃফোটা গোলাপের মত দল বিকশিত হয়ে, পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি মেলে হেলচে দুলচে, অঙ্গভঙ্গি করছে—কারুর হাতে স্প্যানিস গীটার, কারুর হাতে ক্ল্যারিওনেটের বাঁশি, কেউ-বা নিয়েছে জগঝম্প, কেউ সেজেছে জীপসী, কেউ-বা রেড ইণ্ডিয়ান, কেউ কাউবয়। কোনো তরুণীর নিরাভরণ অঙ্গে নিরাবরণ কান্তি উঁকি দিচ্ছে, কারুর বা হাওয়াই দেশের হাওয়াই সাজ, কারুর সজ্জায় কেশাভরণে দক্ষিণসমুদ্রের মত্ত আবহাওয়া। তাদের নাচের ভঙ্গিটা ব্যালে না ওয়ালটজ্, সাম্বা না রাম্বা, পল্কা না ফক্সট্রট, হুলাহুলা না চা চা তা বলতে পারব না। সে কথা নৃত্যবিশারদদের জন্য মুলতুবি থাক, তবে মনে হল নাচে-গানে হাস্যে-লাস্যে ভঙ্গিতে-ইঙ্গিতে শুধু একটি বিশালপ্রাণই জন্ম নিচ্ছে না, নিয়নলাইট উদ্ভাসিত সেই চত্বরে এক রসসমৃদ্ধ জীবনের বিচিত্র আদিম অভিব্যক্তিকেও প্রত্যক্ষ দেখলাম—প্রাণগঙ্গার উচ্ছল বারিধারায় অভিষেক। নাচত নাগররাজ, ঝমর ঝমর ঝম—

হোঃ চা, হোঃ চা, হোঃ চাঃ
জিটার বার্গ, জিটার বার্গ, জিটার বার্গ

ইতিহাসের দাবীতে মার্কিন মুলুক ত হাঁটুর বয়সী। কলম্বাস তাকে জন্মটীকা পরালে মোটে কয়েক শতাব্দী আগে। ইউরোপ তাকে উপনয়ন দিয়েই ছেড়ে দিয়েছিল প্রান্তরে প্রেয়ারিতে, দামাল ছেলের মত। অবশ্য এর সঙ্গে ছিল একদল ভগবদ্বিশ্বাসী ধর্মভীরু কর্মঠ স্বপ্নালু মানুষ। আজও দেখতে পাচ্ছি জাহাজ দুলছে, তুফান ছুটছে, মেফ্লাওয়ারের 'পিলগ্রিম ফাদাররা' অতলান্তিক পেরুচ্ছে—কর্ণধারের নাম নিয়ে তাদের যাত্রা হল শুরু। এগিয়ে এল ইনকা, আজটেক, রেড ইণ্ডিয়ানদের দল—হাওয়াইথার গান জমল ভালো, তাদের নাচ হলো রপ্ত। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, রব উঠল ভুবনে—গাঁইটি হাতে, ওয়াগনে চড়ে, ঘোড়ার পিঠে, হেলতে দুলতে নাচতে নাচতে এগোলো মানুষগুলো। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দুয়ারে ধাক্কা দিলেন আমেরিকার কুললক্ষ্মী, ইতিহাস-লতিকা—রূপসী তন্বী। তার 'তনমনধন্' ধাঁধা লাগিয়ে দিল সারা পৃথিবীর—দলে দলে লোক ছুটল I go West.—ইতালি, জার্মানী, স্পেন পর্তুগাল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোলাণ্ড, রাশিয়া, স্কাণ্ডিনেভিয়া, এমন কি জাপান, চীন, ভারত সবাই পাঠালে প্রতিনিধি—চল ভাই চল—সোনার দেশ—অফুরন্ত লক্ষ্মীর ঝাঁপি সংগ্রহ করে নাও—মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার। দুটো শতাব্দী ধরে চলল এই রেষারেষি, এই বিরহমিলনের পালাবদল। মহামানবের সাগরতীরে সবার পরশে পবিত্র করা গড়ে উঠল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চার শো বছরের জগাখিচুড়ির এক পাঁচমিশেলি ইতিহাস। তার শিল্পকলাতেও এই মিশ্র পরিচয়—দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে। গুহামানবের দিন হতে আজ পর্যন্ত অঙ্গভঙ্গীসহকারে সুরের তালে তালে হস্তপদ সঞ্চালন, মানবমনের একটা আদিম বিভঙ্গেরই রূপ। এর মধ্যে যৌন আবেদন কতটা আছে, কতটা লৌকিক আচার বিচারের প্রশ্রয়, কতটা অবচেতনের প্রকাশ, কতটা অধিচেতনের আভাস, তার সমাধান ফ্রয়েডীয় নীতিবিদরা বা মার্ক্সীয় ডাইলেকটিকসবিশারদরা করুন, আমরা নৃত্যকে নৃত্য বলেই মেনে নিই।

প্রত্যেক নৃত্যশিল্পের প্রধানতঃ তিনটি রূপ—

প্রথম, নাচ হচ্ছে কৌম জীবনের অভিব্যক্তি, তার প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস (dance as an expression of the lore and the land)।

তবু হে কালের অধীশ্বর
হতাশ আমরা হবোনা।

হতাশ তারা হয়েছিল কি-না জানি না তবে হাল ছাড়ে নি। আমেরিকায় তারই পরিচয় পেলুম। ঊর্মিচঞ্চল ঝঞ্চামুখর সমুদ্রের বুক চিরে কঠোর কশাঘাতে দুলতে দুলতে ডুবতে ডুবতে, মেফ্লাওয়ার চলেছে—আশা আশাঙ্কা, প্রেম ভালবাসা, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, লোভ মোহ, অত্যাচার অবিচার, অনাচার অপচয়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে। কেউ যাচ্ছে পেটের জ্বালায়, কেউ যাচ্ছে পালিয়ে, কেউ যাচ্ছে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে। কিন্তু আমাদের নিক্তিতে যে যাই হোক, সবাই নূতনের উন্মাদনায় প্রাণচঞ্চল। কলম্বাসের আবিষ্কার ভারত-আবিষ্কারের রেশ। আজও তার স্মৃতি জেগে রয়েছে পূর্ব-ভারতীয় পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নামকরণের মধ্যে, ও দেশের প্রাচীন মানুষদের রেড ইণ্ডিয়ান সংজ্ঞায়। কে জানে এই ক্ষীণ সূত্রটি কি শুধু আকস্মিকের মালায় গাঁথা। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে ভারতবর্ষের কবির এই কল্পনা শুধু কি উচ্ছ্বাস না ইতিহাসের একটি অমোঘ সূত্র। মুনি অতীত ভারতবর্ষকে নিয়ে অনেক দিন থেকেই অনেক কথা শুনিয়েছেন। ইতিহাসের হিসাব নিকাশে শতযুগান্ত আগে যে মানুষ এসেছিল, আমাদের অতি-অতি-অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ যাঁরা, তাঁদের পদযাত্রা শুরু হল কবে, কত হাজার বছর পূর্বে, কোন্ প্রস্তর যুগে, কিন্তু যে দিন আমরা ভারতলতিকার গুণ্ঠন উন্মোচন করলাম সেদিন ত তিনি পরিপূর্ণ যৌবনা যেন আলোক মাতাল স্বর্গসভার বহু আবরণভূষিতা দেবী মিনার্ভা (Minerva born in a panoply)। সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর নানা ব্যাপ্তি, নানা প্রসার, নানা বিচিত্র অভিব্যক্তি, রূপ ও রস শুধু সীমায় নয়, অসীমেও, অলক্ষ্যেও। আর্য অনার্য শক হুন পাঠান মুঘল ব্রিটিশ যুগ পরিয়ে আজ আমরা স্বাধিকার মগ্ন এক নূতন তীর্থে। আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের ধর্ম, আমাদের নীতি, আমাদের সাহিত্য, আমাদের চিন্তানায়করা সকলেই সেই ভাবচেতনার কথা বলে গেছেন, যা আমাদের অবৈর করবে, আত্মদ্রোহী করবে না, যা আমাদের সুখসমৃদ্ধি, জ্ঞানবিজ্ঞান, জীবনধারণের উন্নত মান ও সুসংযত সমাধান করে দেবে, শুধু পারলৌকিক চেতনায় নয়—ইহৈব, এইখানকারও।

আজকের পৃথিবীতে চোখ চেয়ে দেখলে মনে আপনি জাগবে যা দেখেছি যা শুনেছি তুলনা তার নেই। আজ সমস্ত পৃথিবী যেন একটা ছোট্ট গণ্ডী, সকালে কলকাতায় চা খেয়ে রাত্রে নিউ ইয়র্কে ডিনারে বসি। শুধু তাই কেন,

সমুদ্রতরঙ্গিত পৃথ্বী ছাড়িয়ে উধাও হয়ে যাই সুদূর নীলিমে, নীহারিকার রাজ্যে, চন্দ্র মঙ্গল বৃহস্পতিকে পেরিয়ে, অঙ্ক করতে বসি কবে যাব শুধু গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নয়, অন্য সৌরমণ্ডলে, অন্য আলোর রাজ্যে—আর এক মহাশূন্যে। পিছনে পড়ে থাক আলো-বাতাসের এই পৃথিবী—যান্ত্রিক মানুষ আজ চলেছে ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে স্ট্রাটোস্ফিয়ার, আয়ানোস্ফিয়ার পার হয়ে, নভঃতলে পাখা মেলে, তরঙ্গায়িত অসীমের আলিঙ্গনে। তাই আজ আমি যে দেশেরই মানুষ হই না কেন, সব দেশেই আমার ঘর আছে। অবশ্য আমার নাড়ীর টান আমার মাটির সঙ্গে, আমার সভ্যতা, সংস্কৃতি, তার বিকাশ তার প্রকাশের সঙ্গে, আমার বিবর্ধমানতার ইতিহাস তার রস পাবে সেই চেতনার উত্তেজনায়। সেই আসল জিনিসটির উপর যখন আঘাত পড়ে—যে দিক দিয়েই পড়ুক—যে স্থূল হস্তের অবলেপেই আসুক—মরুকান্তারেই হোক, হিমগিরিতে হোক, বহিরঙ্গেই হোক বা অন্তরাশ্রয়ীই হোক সেই আদর্শের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ হতেই হয়। আজকের যুগে প্রত্যেক চিন্তাশীল দেশ ও মানুষের দুটো সীমা—একদিকে সে বিশ্বনাগরিক, একদিকে সে মুক্ত বিহঙ্গম, আর-এক দিকে সে নিজের গণ্ডীতে আবদ্ধ—কিন্তু সে গণ্ডী, সীমার বটে কিন্তু আনন্দের, সেবার, প্রেমের, আদর্শের, অকুণ্ঠ নিষ্ঠার। আত্মকেন্দ্রিক জীবনেও যেমন সুতো খোলা আর লাটাই গুটিয়ে ফেলা, তেমনি সমষ্টিকেন্দ্রিক জীবনেও আমরা কঠোর স্বদেশভক্ত, সীমিত অথচ বিশ্বহৃদয়ের সঙ্গে স্পন্দিত। এই চেতনাই রামমোহনের, বিবেকানন্দের, রবীন্দ্রনাথের, জওহরলালের। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, আমেরিকাকে যদি দেখা যায় তাহলেই বোঝা যাবে কোথায় আমাদের সেই সেতুগুলি Bridges of Understanding। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে এদিক দিয়েও দেখলে মনে হবে সমধর্মী, সমমর্মী।

আমেরিকা তখন কয়েক বছরের শিশুরাষ্ট্র—হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়। কিন্তু তখনি তার অর্ণবপোত সাতসমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই দেখি কলকাতা বন্দরে জাহাজ এসে লেগেছে। শোনা যায় বাইশ বছরে আমেরিকার স্যালেম বন্দর থেকে একুশ বার একখানি জাহাজ এসেছিল, তার নাম ছিল 'জর্জ'। কলকাতা নামকরণ করেছিল—'দি স্যালেম্ ফ্রাইগেট্'। ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের ইতিহাসে ইংরেজ-অধ্যুষিত কলিকাতার দু জন আমেরিকানকেও সেই যুগে কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দারূপে পাওয়া যায়। তাঁদের নাম স্যামুয়েল 'শ' আর বেঞ্জামিন 'জয়'। ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী রামদুলাল দের কারবারের প্রধান অংশই ছিল আমেরিকার সঙ্গে, তাঁর নামে একটি

যা ছিল বাঁকা-চোরা তা সোজা হলো

... ...

যা ছিল সুন্দর তা মিলল অবিন্যস্তের সঙ্গে

যখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি নন, যখন তাঁর নাম আমেরিকায় কেন ইংলণ্ডেও বেশি লোক জানে না তখন হ্যারিয়েট মনরো, এজরা পাউণ্ড প্রভৃতি মার্কিনী কবিরাই তাঁকে আবিষ্কার করলেন মহিলা কবি ও শিল্পী শ্রীমতী মুডীর বৈঠকখানায়। ফায়ারপ্লেসে আগুন পোহাতে পোহাতে গীতাঞ্জলি পড়ছেন কবি বাংলায় ইংরাজীতে আর মুগ্ধ হয়ে আছেন তাঁহার শ্রোতা ও শ্রোত্রীর দল—আমেরিকায় বসে কল্পনা করতে পারি সেই পরিবেশে সৌন্দর্যের পর সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে।

কবি শিকাগোতে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমি ভালবাসি, আমার আশে পাশের মানুষদের। আর মর্যাদাও দিই তাদের ভালবাসার" এই ভালবাসাই দূরকে করে নিকট, পরকে করে আপন। এই মন্ত্রই ব্যষ্টির সাধনার মন্ত্র, সমষ্টির চেতনার সূত্র—

যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু
আজকে তোরে কেমন ভেবে গায়ে ছুঁড়ে ধুলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে ছুটবে রে তোর পিছু পিছু ॥

॥ ছত্রিশ

ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি সারকথার এক কথা যে বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বসতি। তাঁকে পেতে গেলে অনন্য হয়ে তাঁর পূজা করতে হয়, রাত্রি জাগরণ করতে হয়, তবেই তিনি আসেন দেখতে যে তার তপস্যায় একমন একপ্রাণ হয়েছে কে—কোজাগর্তীতি মহীতলে। সমুদ্র ডিঙিয়ে সপ্তডিঙ্গা চড়ে সাত সদাগর চলেছেন লোকলস্কর নিয়ে—এমনতর কত ধন-পতির কাহিনীই আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে আছে। সাগরে সাগরে তাঁরা শুক্তিমুক্তা কুড়িয়েছেন, চন্দন কাষ্ঠের ভারে বোঝাই হয়েছে তরী, সূক্ষ্ম মসলিন তাঁরা পাঠিয়েছেন দেশেদেশান্তরে, আরব থেকে এনেছেন তেজী ঘোড়া, ইরান তুরান থেকে তন্বী সুন্দরী, জাভা সুমাত্রা দ্বীপময় ভারত থেকে কত মশলা। তাঁরা নাকি সমুদ্র পার হয়ে খাস মার্কিন মহাদেশেও পাড়ি জমিয়েছেন—ময় সভ্যতার দান নাকি তাঁদের, ইনকাদের সঙ্গে চলত নাকি

আদান-প্রদান, মেক্সিকোতে ছিল গমনাগমন। আবার শুনেছি কমলে-কামিনী দেখে তারা মজেছেন, বিদেশিনী তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখাদের সঙ্গে আরক্ত অধরে প্রেম বিনিময় করেছেন, শ্রেষ্ঠীদের দেখেছি শুধু রাজার সভায় নয়, মদন স্মরতোৎসবেও, দেখেছি নিপুণিকা শোভনিকাদের আরাম-কুঞ্জে কাননঘেরা বাটীতে। সাত ভাই চম্পার তবু ঘুম ভাঙে নি, সোনার-বরণ পারুল বোনের ডাক সত্ত্বেও। তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে, শুধু শুকশারী গেয়ে গেছে—রাই জাগ, রাই জাগ।

শুক বলে সমাধিতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি
শারী বলে মেঘমালার নিত্য নূতন সৃষ্টি
তাই সে চিরন্তন

রাই জেগেছেন, পদে-পয়ারে-ছন্দে-কীর্তনে গদগদ হয়ে ব্রজের রজঃ আমরা মাথায় নিয়েছি কিন্তু সপত্নী যে একেবারে সতীনের এলাকা থেকে অন্তর্ধান। মার্কিন মুলুকের খাসতালুকে এসে মহা ঐশ্বর্যের নিম্নতলে বসে চল্লিশতলা বাড়ীর চোদ্দতলার এক নিভৃত ঘরে পূজনীয় শ্যামখুড়োদের দিকে চেয়ে কানে শোনা সেই তিমির হৃদবিদারণ মরণ-বারণ মন্ত্রটি প্রাণপণে জপ করছি—টাকা, টাকা, লক্ষ্মীশ্রী কমলা বিদ্যা মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী—টাকা, টাকা—ডলার, স্টার্লিং, মার্ক, ইয়েন্—নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, হ্যামবুর্গ, টোকিয়ো, আর টেলিভিশনের দিব্যদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছি—

নাচত নাগর রাজ
ঝমর ঝমর ঝম
ঝমর ঝমর ঝম
....
মুচকি মুচকি মধু হাস
কিঙ্কিনী কনকন, কিনিকিনি কনকন

আমার 'উমরকুমর বুঢ়া' হয়ে গেছে—জ্যাজ্ ওয়ালজ্, ফক্সট্রট, হুলাহুলা, রক এণ্ড রোল চলে না, তবু মনে পড়ছে ঝুমুরগানের এক কলি—

দিদির দিদাং, ধিতাং ধিতাং,
মোর ঘর যাবি কি, মন দিব লিবি কি
ছলমন লিব না, যৈবন দিব না।

ওয়াশিংটনে উঠেছি সকালে সাড়ে সাতটায়, নামিয়ে দিলে দশটার কিছু পরেই। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মাঝে বড় বড় যে লেক আছে তারই একটির

কোলের কাছে আমাদের গন্তব্যস্থান। শহরের নাম বাফেলো—লেক্ এয়ারির ধারে একটি সুন্দর শহর। চমকাবেন না, নামটা সত্যিই বাফেলো লংফেলো নয়। কবি বলতেন—

তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্যলেখার বদঅভ্যাস
মনে ছিল হই বুঝি বাল্মীকি কি বেদব্যাস
কিছু না হোক লংফেলোদের হব আমি সমান তো
এখন মাথাঠাণ্ডা, হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।

সত্যি, শরৎচন্দ্র নই যে মহেশের গল্প লিখব, রবীন্দ্রনাথ নই যে গ্রাম্য রাখালের দুর্দান্ত মহিষপ্রীতি কাব্যে অপরূপ মোলায়েম করে ফুটিয়ে তুলব। বহাল তবিয়তে আছি বলে যমের বাহনের সঙ্গে যোগাযোগ এখনও ঘটে ওঠে নি। ঘিউএর ব্যবসায় করি না, তবে উৎকৃষ্ট ঘৃত হলে সদ্যোভর্জিত গরম গরম লুচির উপর এই বৃদ্ধ বয়সেও সম্প্রীতি সুমতি আছে।

সহযাত্রী ও যাত্রিনীদের মধ্যে অনেকেই যুগলে চলেছেন। মহিলাদের বিশেষ বর্ণনা করার সাধ থাকলেও সাধ্য আমার নেই—কেউবা 'লাজুকবদন', কেউ বা 'সিঙ্গার', কেউ বা 'পিয়ার', গরবিনী ত সবাই। আমি কালিদাস নই যে পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনীদের আধুনিককালের নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট দেব। ঢেউএর উপরে ঢেউ বেয়ে নীলা জলধিতীরে সে দিনের মিথুনলগ্নে এসে লাগল একজোড়া নববিবাহিত কিশলয়—ভারসিটির গন্ধ তখনও গায়ে লেগে—হনিমুনে চলেছে নায়েগ্রায়। বাফেলো থেকে নায়েগ্রা খুব বেশি দূর নয়—নদীর এ পারে যুক্তরাষ্ট্র, ও পারে কানাডা। সামনে 'রেনবো' ব্রিজ। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা মোটর গাড়ির লাইসেন্স দেখিয়েই দিব্যি যাতায়াত করতে পারে—কাস্টমস্ ইমিগ্রেশন্ নাকচ হয়ে যায়। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে ভারতীয়দের এইটুকু সুবিধা যে কানাডায় ঢোকা সহজ, নিষ্ক্রমণের পথের জন্য হাতিয়ার চাই 'ভিসা'।

ধনতান্ত্রিক তত্ত্বের বিচারে আমরা যদি এখন থাকি 'take off'-এর যুগে অর্থাৎ সবে প্রাচীন পদ্ধতি আর ট্রাডিশনের মোহ ছাড়িয়ে বড় বড় কল-কারখানা গড়ার দিকে ঝুঁকি ও ধন উৎপাদনে ব্রতী হই, তাহলে আজকের আমেরিকাকে তুলনায় বলা যেতে পারে বিত্তমান বা 'Affluent' সমাজ যেখানে higher mass consumption বা বেশি হারে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন করে চাহিদা ও জাতীয় আয় বাড়ান হয়। অনেকে মনে করেন আমেরিকার অর্থনৈতিক বনিয়াদ এমন সুদৃঢ় স্তরে পৌঁছেছে যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে

তার নাগরিকদের সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হবে না। সোভিয়েট রাশিয়াতেও ঐ সময়ের মধ্যে সাধারণের জন্য মাথার উপর আশ্রয়, খাবার জন্য রুটি প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য বহু জিনিস বিনামূল্যে যাতে দেওয়া যায় তার পরিকল্পনা হচ্ছে। একদিন রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে রাশিয়ার বিরাট উন্নতিমূলে কোন্ শক্তি কাজ করছে। ত্রিশ বছর আগে কবির অখণ্ড দূরপ্রসারী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে এই বিপুল আয়োজন সম্ভবপর; কেননা ধনপ্রবাহকে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির খাতে বহিয়া দেওয়া হয়েছে (turning the tide of wealth from the individual to collective humanity). আমেরিকাতেও অন্যদিক দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। যান্ত্রিক উপায়ে অর্থলাভকে বহুগুণীকৃত করা সম্ভবপর যখনই হয়, তখনই সেটাকে বলতে পারি বণিক ধর্ম—কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—ভোগে আসে কার? কুবেরের ভূমিকা পাকা করবার ঐতিহাসিকতা কী, সে বিষয়ে গবেষণা না করেও একথা বলা যায় যে মহালক্ষ্মীর প্রসাদ পেতে হলে শরৎপ্রসন্ন দিনে মনকে একটু ছুটি দিতে হয়, লাগাম খুলে ধরতে হয়, জীবনের নিজস্ব নীতিকে নূতন করে গড়ে তুলতে হয়, একটু গভীরতার স্রোতে অবগাহন করতে হয়—তা না হলে সেই চিরকালের প্রশ্ন উঠবে ততঃ কিম্, কস্মৈ দেবায়—এহ বাহ্য এহ বাহ্য।

তত্ত্বকথা থাক—ভাবছি যখন লোকেদের সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টার বেশি খাটতে হবে না রুজী রোজগারের জন্য, তখন সেই ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ডে বাকী একশো আটত্রিশ ঘণ্টা কি ঘুমে প্রেমে মজায় মজলিসে পিকনিকে পার্টিতে কাটবে—Philosophy of leisure শুধু নয় psychology of leisure-কি হবে তার physiology. আজকের দিনের এই দুর্দান্ত গতি কি নিভে যাবে মন্ত্রৌষধি রুদ্ধবীর্য ভুজঙ্গের মত—ট্রান্‌কুইলাইজারের কী আর দরকার পড়বে না—করোনারীর বদলে বরনারীকে আশ্রয় করলেই শ্রেয় ও প্রেয় দুই জমবে!

আমেরিকার ইতিহাসে "I go West" "America on the wheels" এই স্লোগানের সঙ্গে যে চাঞ্চল্য শুরু, তারই জেরে আজ সে ঊর্ধ্বমুখী সূর্যমুখী—শূন্যে মহাশূন্যে পাখা মেলে চলেছে কালকের দিনের মানুষ, মহাকালের যাত্রী হয়ে। চলো, এগোও, দলে দলে জনে জনে—একদিন বীরভোগ্যা ছিল এই ধরিত্রী, আজ বীর্যশুল্ক হবে এই শূন্যের প্রান্তর। কশো বছর আগে অতলান্তিকের ধারে, এ-ধারে ও-ধারে, ছড়ানো কয়েকটি ব্রিটিশ সেটেলমেণ্ট

জর্জিয়া থেকে বোস্টন ব্রাহ্মণদের পীঠস্থান ম্যাসাচুসেট্‌স পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আজ তারাই ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। 'মে ফ্লাওয়ারের' 'পিলগ্রিম ফাদারসকে' নমস্কার, জাতির ঐতিহ্যে তাঁদের অনমনীয় দান আজও সব মানুষ স্মরণ করে। প্রেয়ারির ক্রন্দন ভেদ করে, মাটির কান্না ফুঁড়ে, শূলবিদ্ধ অরণ্যের হাহাকার ছাপিয়ে গড়ে উঠেছে লুইসিয়ানা থেকে ডেট্রয়ট আর নিউ ইয়র্ক থেকে টেক্সাস, বেভারলি হিল থেকে বাফেলোয় একটা পরমাশ্চর্য ঐশ্বর্যের সফেন উচ্ছ্বাস। জানি দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। মানুষ নিজের মধ্যে যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গড়েছে সেই গতিময়তা তাকে থামতে দেবে না, স্তব্ধ হতে দেবে না, চুপ করে বসে ভাবতে বলবে না, সে চলবে—দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে নয়, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, মহাশূন্যের নীলিমে—সেদিন দূর নয় যেদিন ভিনাস সুন্দরীর (যদি তিনি থাকেন) সঙ্গে মর্ত্যনন্দনের যোগাযোগ ঘটবে পলে পলে বেতারে ইথারে। কেউ নিশান্তে দিনান্তে একবারও বলবে না—মন তুমি শুদ্ধ হও।

আজকের আমেরিকায় কেন, সব সভ্যদেশের mass media-র ইতিহাস দেখলেই এই অশান্তির দ্রুততা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা অসম্ভব নয়। সাবিত্রী মন্ত্র আমরা ত্রিসন্ধ্যায় স্মরণ করি। এরা ব্রাহ্মীবৈষ্ণবী মাহেশ্বরীকে একত্র গুলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পলে বিপলে তারে বেতারে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ১৯৫৬ সনের এক স্ট্যাটিসটিকসে দেখি (ব্যাড্‌ফোর্ড স্মিথের বই—Why We behave like Americans) যে বছরে দশহাজার কোটি ডলার খরচা হচ্ছে এই সূত্রে। ছয়শোর উপর মাসিকপত্র, সতের শো দৈনিক, নয় হাজার সাপ্তাহিক, প্রায় তিন হাজার রেডিয়ো স্টেশন আর পাঁচ শো টেলিভিশন কেন্দ্র শব্দব্রহ্ম হয়ে মহাব্যোমে ছড়িয়ে পড়ছে। এ হল পাঁচ বছর আগের কথা। ন্যাশান্যাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানী লরেন্স অলিভিয়ারের '*Richard II*' পাঁচ লক্ষ ডলার খরচ করে টেলিভিশনে অভিনয় করালেন আর পাঁচ কোটি লোক ঘরে বসে তা দেখলে। স্বভাবতই রেডিয়োর চিত্তপ্রিয়তা পিছিয়ে পড়েছে। তবু এখনও 'যা দেবী রেডিয়োরূপেণ অবস্থিতা' তাঁকে অধিষ্ঠিত দেখি স্নানের ঘরে, শয়ন কক্ষে, রান্নামহলে আর সবচেয়ে বেশি মোটর গাড়িতে—অর্থাৎ হাত বা চোখ যখন অন্য কাজ করছে তখন কানটাকে ছুটি না দিয়ে কিছু শুনিয়ে নেওয়া—প্রায় কর্ণমর্দন আর কী। টেলিভিশনের দাপটে সিনেমা, মুভিও কিছুটা হটতে বাধ্য। কিন্তু হলিউডের কৃতিত্ব নাকি ক্রিটিকরা বলেন—ব্যাং ব্যাং আর কিস্‌-কিস্‌। এই নামকরণ করেছেন তাঁরা, যাঁরা বলেন কাউবয় ফিল্ম, গ্যাংস্টারের ছবি আর

কোনো রকমে একটি নরম নারীদেহ নিয়ে টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি ছাড়া শতকরা আশিটা ফিল্মে আর বিশেষ কিছু নেই। কথাটা সত্যি কি না জানি না কিন্তু আংশিক সত্য হলেও ওরই পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান সমাজকে বিচার করবার ধৃষ্টতা যেন আমাদের না হয়—তা বেশ বোঝা যায় এই দেশে দুদিনের জন্যও এলে। শুধু মারামারি, কাটাকাটি, প্রেম, লুব্ধতা, গৃধ্নুতা দিয়েই আমেরিকা নয়, শাশ্বত ভাবুক মানুষ সব দেশেই সমান। ওয়াশিংটন, জেফারসন, টম পেইন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, আব্রাহাম লিঙ্কন, টেডি রুজভেল্ট, উড্রো উইলসন, এফ ডি আর-দের কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ তাঁরা রাষ্ট্রনেতা, রাজনীতির আবর্তে ঘোরেন, কিন্তু শহর থেকে দূরে চলে যান, পেনিসিলভিনিয়ার বেথেল-হেমের 'Bach Festival'-এ উপস্থিত হন দেখবেন মোর্জাট, বীঠোভেন, ভিভাল্ডিকে পাবেন। রকীজ পেরিয়ে গ্র্যাণ্ড কেনিয়নের সীমানা ছাড়িয়ে যান টেনিসিভ্যালিতে, দেখবেন 'নিউডিল' কি ধরনের উন্নতি করতে পারে। চিরকালের মানুষ, সব দেশেই এক। ফোর্ড, কার্নেগী, রকফেলার, রাসেল সেজ, জন সাইমন, গ্যাগেনহিম ফাউণ্ডেশনের কথা সারা পৃথিবীর সবাই জানে। ধনকুবের এরা, এও সত্যি। লংফেলো, এমার্সন, এজরা পাউণ্ড, এডগার এলান পো, ওয়াল্ট হুইটমান, সিনক্লেয়ার লুইস, আপটন সিনক্লেয়ার, হেমিংওয়ে, ও'হারা ত আমাদের অতি সুপরিচিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত কর্তব্যের সামঞ্জস্য থাকলেই শুভ, না থাকলেই অশুভ। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে আমাদের দেশে আগেকার পল্লীসমাজ ছিল। গ্রামে বিশুদ্ধ জল, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, কথা, পথঘাট সমস্তই রক্ষিত হত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজ-মুখীন প্রবাহ থেকে। এটা ঠিক চ্যারিটি ছিল না—স্বেচ্ছা ও সমাজের ইচ্ছা দুইই মিলত এক কর্তব্যবোধে। তফাত যে আজকে রাষ্ট্র সেই কর্তব্যবোধটাকে নিজের হাতে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত করছে। ফলে লাভ হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু ক্ষতিও কিছু হয়েছে সেটাও ঠিক—সহজ সামাজিক বন্ধনের যে উদারতা তা মিলিয়ে যাচ্ছে, কর্তব্যবোধের যন্ত্রের মধ্যে।

এখানে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল। আকাশের চন্দ্রাতপের নিচে তন্দ্রাহত ইন্দ্রধনুর সাতরঙার রঙের মোসেইককে প্রকৃতি যেন সাজিয়ে রেখেছেন তার পশরা। অভ্রভেদী হিমালয়ের আকাশগঙ্গার রূপ দেখেছি, অলকানন্দামন্দাকিনীর শিকরস্পৃষ্ট উপল ব্যথিত কলস্বনার ভীমগর্জন শুনেছি, মহাসমুদ্রের বুকে তরঙ্গ-বিভঙ্গের উন্মাদনার উত্তালতাও কল্পনা করতে পারি, নদীর বুকে কালবৈশাখীর ভয়ভৈরবের প্রমত্ত রূপও ক্ষণে ক্ষণে স্মরণে আসে কিন্তু এই বিরাট জলধারার

যে এক নিজস্ব রূপ ও রীতি আছে তা সত্যিই অপূর্ব। সকালে বিকালে রাত্রে, গভীর নিশীথে তার ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ছন্দ, ভিন্ন মূর্তি। হোটেলে নামটা লিখিয়েই ছুটলাম জলের ধারে। কানাডার দিকের ধারাগুলোই বেশী জমকালো চমকপ্রদ অশ্বখুরাকৃতি। বিরাট লেকের সব জলই যেন এলোকেশী হয়ে নেমে আসতে চায়। পাহাড়ের বুক চিরে ধাপে ধাপে নেমে আসা কলগর্জনা ভীমাকে ভাল করে দেখবার জন্য কত বন্দোবস্ত আছে—এলিভেটারে নিচে নেমে, জাহাজে চড়ে ঘোরা যায়। বিকালের দিকে ম্যাকিণ্টশ আর বুট পরে জাহাজে চড়লাম। স্রোত ঠেলে যাচ্ছি—উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের প্রতিটি কণাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে বললাম —তৃপ্যন্তু—আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হক।

জাহাজে অনেক যুগলের মাঝে প্লেনের কিশোর-কিশোরীকে আবার দেখলাম। আমার শ্যামসোহাগী গায়ের রং, শ্রীমুখের বনোয়ারী ছাঁদ, অকুঞ্চিত কৃষ্ণকুন্তল অনেককেই প্রশ্নে প্ররোচিত করত যে, আমি কোন্ দেশের মানুষ, আর তারপর ভারতীয় না পাকিস্তানী। ছোকরাটিও আমাকে সেই প্রশ্ন করলে, অত্যন্ত সৌজন্য আর ভদ্রতার সঙ্গে। ভারতীয় জেনে 'গান্ধী' ও 'তাগোরে'র কথা জিজ্ঞাসা করলে—রবীন্দ্রনাথের বই পড়েছে, ক্রেসেণ্টমুনের নাম জানে, পোস্ট অফিসের অভিনয় দেখেছে—তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী ছাত্রদের যাতায়াত আছে। মেয়েটিকে মনে হল ফরাসিনী। আঁদ্রে জিদ্ থেকে জ্যা পল সাত্রের কথা উঠল, অস্তিবাদীদের গল্পের সঙ্গে আলবেয়ার কামুর নাম পর্যন্ত। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তখন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। সমুদ্রধারের বুড়া মানুষ, মার্লিন মাছের কথা ম্যানোলিন সান্টিয়াগোর চরিত্র সবই কিছু এক মিনিটে শোনা ও বলা গেল। নিউ ইয়র্ক টাইমসের দু লাইন কবিতা মনে ছিল।

Whittled a style for his time from a walnut stick
In a carpenter's loft in a street of the April city

আমি বললাম—April city কাকে বলে জানেন?

তারা বললে—না তো।

আমি হেসে জবাব দিলাম—গে পারী—রাজার নন্দিনী পিয়ারী।

হো হো করে উল্লসিত হয়ে বললে তারা—আমাদের লেগপুল করছেন না ত —এপ্রিল ফুল—

উত্তর দিই—আমাদের তাগোরের একটা কবিতা নির্ভেজাল বাংলায় শুনুন, আমাদের দেশে এপ্রিল মাস, মধুমাস—বসন্ত কাল—

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ—
এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল
পথতরু শাখে ধরেছে মুকুল
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনী গন্ধা

স্তব্ধ হয়ে তারা শুনলে, ইংরাজীতে বুঝিয়ে দিলুম অর্থটা, আর সন্ন্যাসী উপগুপ্তের অভিসার রজনীর মধুচন্দ্র কাহিনী, তারা বললে—তোমাদের দেশেই এ রকম রিপ্রেশনের কল্পনা সম্ভব হয়, আমি বললাম—কেন আনাতোল ফ্রান্সের "থেইস"—

আর একটু গৌরচন্দ্রিকা করে যোগ দিলাম—আমাদেরি দেশের কবিরা গায়—পূর্ণিমার চান্দ সনে চন্দন বাটিয়া গো কে গড়িল গৌরতনু খান। হো হো করে হেসে বললে, তোমাদের জাতটা দেখছি moon struck। আমি বললাম—থাক্ তবে শোনো, রবীন্দ্রনাথের গানের ফরাসী দু'কলি—

ও আঁফনি ত্থ তে মা
লা ফা প্র্য উন মারভেচুস ঘ্যাপারস
হে অশেষ তব হাতে শেষ
ধরে কি অপূর্ব বেশ
তু য়্যাজালুমে ত্থ মঁ ক্যুর
লে ফ্যু দা লা মুজিকি
তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে

তারপর হেসে বললাম—তোমাদের এখন মধুচন্দ্র, আমি আর নষ্টচন্দ্র হয়ে থাকি কেন ?

তোমরা তবে বিদায় দেহ মোরে
অকাজ আমি নিয়েছি সাধ করে
মেঘের পথে পথিক আমি আজি
হাওয়ার মুখে চলে যেতেই রাজি

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, আকাশে ফুটে উঠছে দুটি একটি তারা। ঘাটে ঘাটে শঙ্খঘণ্টামুখর মন্ত্র নেই বটে, কিন্তু অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জে আনন্দের অট্টহাসে বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলেছে। আজকের দিনের কবির কথায় নায়েগ্রাকে আজও জানাই আমার অভিবাদন—

তোমারে হেরিয়াছিনু একদিন, কুঙ্কুম অরুণিত সন্ধ্যায়
স্মরণ—সরণি ধরি আজিও সেদিন পানে মন ধায়,
তোমার নয়নে ছিল পল্লব ছায়া করা স্বপ্ন-মদির মুখ-তন্দ্রা
কবরী ঘেরিয়া সখি ফুটিয়া উঠিয়াছিল মল্লীমুকুল মধুগন্ধা।

॥ সাঁইত্রিশ

আমেরিকায় যাবার ও ফেরবার পথে লণ্ডন হয়েই গিয়েছিলাম। ইতিহাসলক্ষ্মীর বিচিত্র গতিতে আজকের মানসিক ভারতবর্ষের অনেকখানিই ব্রিটিশের আওতায় গড়া। বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্যর নাম আমরা করি বটে, বেদ উপনিষদ পুরাণ কোরান জাতক নাটক নিয়ে নাড়াচাড়াও করি,—প্রাচীন ভারতবর্ষে কী ছিল না, কী পাই নি তার হিসাব মিলাতেও কার্পণ্য থাকে না,—তবু ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের সম্বৃত সমধু উপকরণে রসদ জুগিয়েছে পশ্চিমী চিন্তা জ্ঞান ধ্যান বিচারবোধ বিজ্ঞান রাষ্ট্রবোধের চেতনা। তাই ভারতবর্ষের ও শিক্ষিত ভারতবাসীর সঙ্গে ব্রিটেনের তথা লণ্ডনের আত্মিক সম্পর্ক খুব দূর নয়। আমরা বিলাত-ফেরতা ক ভাই কিভাবে হাঁচি বা কাশি সেইটেই বড় কথা নয়, আমরা প্রতীচীর দুর্বার মনন ও শক্তিকে কতটা কুক্ষিগত করতে পেরেছি সেইটেই প্রশ্ন। তাই আজ যখন ইংরেজের সঙ্গে রাজা-প্রজার অস্বাভাবিক সম্বন্ধটা গেল, তখন মোহমুক্ত মনকে স্বীকার করতেই হ'ল যে আমরা ভারতভাগ্যবিধাতার খেয়ালে একদিকে হারালেও, অন্য দিকে কিছু পেয়েছিও। প্রাপ্তিস্বীকার মানে, নতি-স্বীকার নয়—ঋণস্বীকার। রবীন্দ্রনাথ বলতেন—ইংরেজ এসেছিল শুধু মানুষ-রূপে নয়, নব্য ইউরোপের চিত্তপ্রতীক-রূপেও। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। যে দিন সে ভক্তিতে হোক, ভয়ে হোক, বিনারক্তপাতে তার মদমত্ত প্রভুত্বের তরবারির জোরে জের না টেনে নাট্যের অবসান ঘটালে, সে দিন তার মধ্যে নিয়তির নির্দেশ, জনগণমনের জয়ের অভীপ্সা, ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি, মহাকালের পদক্ষেপ দেখলেও—বলতেই হবে যে, সে-চলেযাওয়া আরো রুদ্র, কঠিন ও নির্মম হতে পারত। যে দিন ইংরেজ এ দেশে আসে সে দিন সে সসাগরা সাম্রাজ্যের ধাপে ধাপে উঠেছে, সমুদ্র মন্থন করে

চলেছে তার অর্ণবপোত, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে সাত সাগরের কূলে কূলে দেশ থেকে দেশান্তরে তার অবাধ গতি,—সে নিয়ে আসছে শুধু অগাধ ঐশ্বর্য নয়, অপূর্ব বিস্ময় আর অগণিত মনের ছাপ। তারই ঢেউ লেগেছে তার সাহিত্যে, তার সংস্কৃতিতে, তার শিল্পে, বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে, যন্ত্র-দেবতার উপাসনায়, শিল্পবিপ্লবে।

ইংরেজের কথা বললেই তাই মনে হয়, তার সাম্রাজ্যের কথা শুধু নয়, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান-মননের ইতিহাসের কথা, তার সাহিত্যের কথা। তার সাহিত্যের কথা বলতে গেলেই মনে হয়—স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন-অ্যাভন, এওট সেণ্ট লরেন্স, 'সেক্সপিয়র' থেকে 'শ'। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা:

"তার পর ধীরে ধীরে
অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি
শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি
মধ্যাহ্নের গগনের 'পরে
নিয়েছে আসন তব
সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া।"

একটা কথা মনে রাখা উচিত যে উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে সমাজ বিপ্লব গড়ে উঠেছিল, সেটা উপরতলার হলেও তার ত্রিকাযে চ্যালেঞ্জ, রেসপন্স, এসিমিলেশনের ত্রিধারায় যে ত্রিমূর্তি বেরিয়েছিল তার একটি বিশিষ্ট দিকই হচ্ছে ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ, তার রসভোগ। লণ্ডনে দ্রষ্টব্য অনেক, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখবার সময়ও ছিল না হাতে। সেই-জন্য মনে মনে স্থির করেছিলাম যে বাসের মাথায় বসে বা টিউবে চড়ে সর্পিল গতিতে ছুটোছুটি করব—যাব চেয়ারিং ক্রস থেকে প্যাডিংটন, ইউস্টন থেকে ওয়াটার্লু। ওরই এক ফাঁকে হাইড পার্কে সাবানের পেটির উপরে দণ্ডায়মান বক্তার বক্তৃতা শুনব, বাকিংহাম-প্যালেসে দেখব গার্ড-বদ্‌লি, ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়ে পড়ব দেশের কাগজ, বিরীয়ানী বা পরোটা-মাংস খাব ইণ্ডিয়া ক্লাবে, না হয় বীরস্বামীর রেস্টুরাণ্টে। আর মার্বেল-আর্চ থেকে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে যাবার পথে পিকাডেলি সার্কাসের জনস্রোতে নিজেকে দেব বেমালুম মিশিয়ে। ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি, টাওয়ার অফ লণ্ডন, আর্টগ্যালারি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, পার্লামেণ্ট হাউস—এসব ত আছেই। প্রথমবারে বন্ধুবর সুসাহিত্যিক

দেবেশ দাশ ছিলেন সঙ্গী—করিতকর্মা লোক, মানী গুণী জ্ঞানী শুধু নন, হিসাবীও বটে। পথে যেতে যেতে সওদা করিয়ে দিলেন সস্তায় একটা স্যুট। শেষবারে সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্ত অমিয় বসু ও তাঁর প্রিয়দর্শিনী কন্যা অলকা। এঁদেরই দৌলতে লণ্ডনের কিছুটা দেখা সম্ভব হয়েছিল।

ইতিহাসের অনুরাগী বলেই হোক আর যে কারণেই হোক, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কথা ছেলেবেলা থেকেই মনকে উদ্বেলিত করেছে। লণ্ডনের ব্লুমস্‌বেরির এই প্রতিষ্ঠানটি সারা পৃথিবীর মনস্বী ও চিন্তাশীল লোকদের একটি তীর্থস্থান বললেও চলে। সাউথ্যাম্পটন রোড পেরিয়ে, নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রীটকে পিছনে ফেলে, টটেনহাম কোর্ট রোড দিয়ে যখন গ্রেট রাসেল স্ট্রীটে ঢোকা যায় তখন ব্রিটিশ মিউজিয়াম সম্বন্ধে মস্ত একটা কিছু ধারণা মনে আসে না। বিরাট রেলিংগুলো অবশ্য চোখে পড়ে, আর দেখা যায়—যাকে বলা হয়েছে 'its tympanum sculptures'। গথিক স্টাইলে লম্বা থামওয়ালা বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় যেন আমাদের দেশের বড় জমিদার-বাড়িতে ঢুকছি। অথচ ব্রিটিশ মিউজিয়াম শুধু পুরাতত্ত্বের বা জাতিতত্ত্বের জাতীয় সংগ্রহশালা নয়, এখানে আছে বই পাণ্ডুলিপি মুদ্রা মেডেল, মিশরের, পশ্চিম-এসিয়ার, গ্রীসের রোমের ও অন্যান্য দেশের ঐতিহাসিক নানা নিদর্শন, রিসার্চ ল্যাবোরেটারি, লাইব্রেরি, আফিস, আর্ট-গ্যালারি। প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক সংগ্রহগুলি (Natural History Collections) সাউথ কেনসিংটনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

১৭৫৩ সালে স্যার হ্যান্স স্লোন মাত্র বিশ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে জাতিকে তাঁর শিল্পকলা-সংগ্রহ দান করে যান। পার্লামেণ্ট ঐ বছরেই একটি আইন করে সেটিকে বিধিবদ্ধ করেন। এর পূর্বে কটন লাইব্রেরি ও রবার্ট হারলের সংগ্রহগুলিও হাতে এসে গিয়েছিল। তিনলক্ষ পাউণ্ড তোলা হল লটারির দ্বারা এবং ১৭৫৫ সালে মণ্টেগু হাউস খরিদ করা হল। তারপর দুশো বছর ধরে এই মণ্টেগু হাউসকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ মিউজিয়ামের দ্রুত উত্থান ও উন্নতি।

এরি মধ্যে এসে গেছে প্রাচীন মিশরের বীর্য ও শৌর্যের চিহ্নগুলি, এলগিন ও টাউনলি মার্বলস, গ্রীস রোম সিরিয়া আসিরিয়া প্রভৃতি সমৃদ্ধ সভ্যতার সুন্দর নিদর্শনগুলি, এমনকি ভারতের নানা সংগ্রহ। অমরাবতী ভাস্কর্যের বহু চিহ্ন একমাত্র লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই দেখা যায়। এলগিন মার্বলস্ সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা হয়ত একেবারে অশোভন হবে না। ১৮০১-১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে

লর্ড এলগিন পার্থেননের মন্দির থেকে এই শিল্পনিদর্শনগুলি নিয়ে আসেন। এগুলি অ্যাক্রপলিস পাহাড়ের উপরে দেবী এথেনার মন্দিরের অংশবিশেষ। দেবী এথেনা ছিলেন চিরকুমারী ও এথেনসের পুরদেবী। দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে পনেরোটি বড় বড় প্যানেল, যাদের বলা হত 'metopes'। বর্বরতার সঙ্গে সভ্যতার সংঘর্ষের প্রতীক হিসাবে অর্ধ-মানব অর্ধ-অশ্বের সঙ্গে ল্যাপিথদের যুদ্ধের চিত্র তাতে অঙ্কিত ও খোদিত। নারী তার পণ্যা। গ্রীক শিল্পকলায় এই রীতি প্রবল ছিল।

এখান থেকেই সোজা চলে আসা যায় প্রাচীন মিশর, আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের দেশে। খ্রীষ্ট জন্মাবার তিন হাজার বছরেরও আগে এই সভ্যতার উদ্ভব। তার একটি বিশিষ্ট অংশ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এই বিভাগে গেলে মনে হয় যেন প্রাচীন মিশর তার গুরুগম্ভীর ইতিহাস নিয়ে এখানে সশরীরে উপবিষ্ট। নীলনদের দেশ আর মুনিঅতীত দু জনে মিলে কথা বলে যাচ্ছেন অনর্গল। বিরাট হলের একদিকে দাঁড়িয়ে পঞ্চমবংশীয় সম্রাটরা (২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব) আর এক দিকে দ্বাদশবংশীয় সেনুস্রেত (Senusret ; ২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব)। তারি কাছে তৃতীয় থথমিসের বিরাট লাল গ্র্যানাইট-প্রস্তরের মস্তক (১৪৯০ খ্রীষ্টপূর্ব) আর তৃতীয় আমেন হোটেপের ও টুটেনখামেনের সিংহগুলি। দক্ষিণে দেখতে পাবেন 'রসেটা' প্রস্তর, যা মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাসের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৫ অব্দে এই শিলা-লিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল প্রাচীনলিপি (Hieroglyphic), ডেমোটিক ও তার গ্রীক অনুবাদ। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই শিলালেখটি আবিষ্কৃত এবং গ্রীক-ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন মিশরীয় ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। আর আছে সংরক্ষিত মৃতদেহ (Mummy) ও তাদের শবাধারগুলি (Mummy cases)। শুধু মানুষের নয়, বিগতপ্রাণ নক্রমার্জারও আছে। অষ্টাদশ বংশের (১৪৫০ খ্রীষ্টপূর্ব) সুচারু দেওয়াল-চিত্র বা কবর-চিত্রগুলিও অপূর্ব। একজায়গায় দেখবেন হংসগণনা হচ্ছে, অন্যত্র দেখা যায় কেমন করে শিক্ষা দেওয়া হত সে যুগে—তার রীতিনীতি, পাঠ। ছেলেরা নাম মুখস্থ করছে (Onomastica), লেখকরা কিরকম করে লেখক হতে হয় শিখছে। দেওয়ালে টাঙান রয়েছে কাপড়-বোনার তাঁত, মাকু, নৃত্যগীতপরায়ণ নর্তক-নর্তকীর ছবি। আবার প্যাপিরাসে লেখা পুঁথি পড়ুন—অতীত যুগের কাহিনী—নীলনদীর স্তব—Hymn to Hapi the Nile। সম্রাট্ ইখনাটোনের সৌরস্তবমালাগুলি তো অনবদ্য :

তোমার হিরণ্ময় দ্যুতি সৃষ্টিকে করেছে দৃষ্টিদান
তোমার বিপুল বর্ণচ্ছটা যুগে যুগে মানবচিত্তে অমৃতের বীজ বপন করেছে
তুমি তোমার অমেয় প্রেমের মন্ত্রে দুই বিশ্বকে পরিপূর্ণ ও সার্থক করেছো
হে বিধাতা, তুমি নিজেই নিজের সৃষ্টি।

প্রাচীন মিশরের অসিরিস্-আইসিস্ 'মিথ্' বা কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নিশীথরাত্রের সূর্যদেবতা অসিরিস্ মাঝ-দরিয়ায় তরী বেয়ে চলেছেন নবজীবন লাভের জন্য—তাঁর শত্রু আপোপিস্ অন্ধকারের দেবতা।

ব্যাবিলন, আসিরিয়ার দ্রষ্টব্যগুলিও অনুরূপ। আমরা দেখি সেনাচরিবের তুলনাহীন প্রাসাদের প্রতিলিপি, আস্থুর-নাসিরপালের প্রাসাদসংলগ্ন সিংহ-মূর্তিগুলি, নিনেভে ও নিমরুদের গ্যালারি, বাইবেলের পুরাতন টেস্টামেণ্টে বর্ণিত নানা গল্পের কিছু কিছু উপকরণ। তাছাড়া কপ্টদের হিটাইটদের ফিনিসিয়ানদের ইরানীয়ানদের সভ্যতার বহু টুকরো ইতিহাসের উপাদান। এ ছাড়া দক্ষিণ-আমেরিকার 'ময়' সভ্যতার নিদর্শন আছে, আছে রোমান-ব্রিটেনের বহু ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন, চীন জাপান সদন, এসিয়াটিক সেলুন, ভারতীয় ঘর। তিব্বতের অবলোকিতেশ্বর ও তারা—ভারতের দশহস্ত গণেশের ও দক্ষিণামূর্তি দেবতার সহিত একসাথে লণ্ডনের এই মিউজিয়ামে বসে আছেন। সিন্ধুসভ্যতার 'সীল'গুলিও হারাপ্পা ও মহেঞ্জদড়র মাটির বন্ধন থেকে উদ্ধার পেয়ে চেয়ে আছে—কবে কোন্ সুধী এসে তাদের মনের খবরকে লোকচক্ষুর গোচর করা‍ন।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম একদিনে দেখবার নয়, একসপ্তাহে শেষ করবার নয়, মাঝে মাঝে আড়ালে-আবডালে খেয়াল-খুশিমত বেড়িয়ে আসবার জায়গা নয়। সত্যিকার নেশা নিয়ে নিষ্ঠা নিয়ে যাঁরা এখানে আসেন, তাঁদের নিরলস সাধনা হবে মাসের পরে মাস, বছরের পর বছর,—এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতেই মিতালি করতেই কেটে যায় কত দিন—মশগুল হওয়া ত পরের কথা। এও এক তপস্যা। সে রকম তপস্বীও বিরল নয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগার সম্বন্ধে প্রশস্তি করেছেন বন্ধুবর সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর 'মুসাফির' -এ; তিনি গল্প বলেছেন—এক নিগ্রো ভদ্রলোকের গায়ের রং আবলুষ-কাঠের মত, চুল বরফের মত সাদা—রীডিং-রুমে বিশ বছর ধরে হাবশী মুল্লুকের খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয় সম্বন্ধে পড়ছেন—ইংরাজী ফরাসী জার্মান হীব্রু আরাহময়িক সিরিয়াক—কোন ভাষার গ্রন্থই বাদ দেননি তিনি। আর

আমরা বিশ মিনিটের সফর শেষ করে পঞ্চাশ মিনিট বক্তৃতা দিই, চল্লিশ পাতা দিগ্‌গজী লেখা ছাপাই।

ছোট্ট প্রবন্ধে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কথা বলতে গেলে অনেক কিছুই বাদ পড়ে যায়। আর ব্রিটিশ মিউজিয়াম শুধু ঐতিহাসিকদেরই তীর্থস্থান নয়। সপ্তম এডোয়ার্ড সদনে যান—এখানে প্রথম দ্রষ্টব্য—Print room। ড্রয়িং, এনগ্রেভিং, এচিং-এর এত বিরাট সমাবেশ পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে বলে জানা নেই। পাণ্ডুলিপি-বিভাগ আর একটি অদ্ভুত কীর্তি। পাঠাগার-বিভাগ ত আর-একটা বিরাট ব্যাপার। সেখানে আছে গ্রেন্‌ভিল লাইব্রেরি ও কিংস লাইব্রেরি। সেক্সপিয়রের, প্রথম 'ফলিয়ো' সংস্করণ যদি দেখতে চান, যান কিংস লাইব্রেরিতে, যেমন দেখতে পাবেন মিরাকের আঁকা শ্বাপদসঙ্কুল মরুপ্রান্তরে মাজনুনের ছবি। এই ছবির প্রসঙ্গে মনে পড়ছে লণ্ডনের একটি বর্ষণক্লান্ত ভিজে অপরাহ্নের কথা। অবান্তর হলেও, বলা যেতে পারে গল্পের 'এপিলোগ' হিসাবে। টাওয়ার অফ লণ্ডন দেখে ট্রাফালগার স্কোয়ারের উপর ন্যাশানাল গ্যালারিতে গিয়ে পৌঁছলাম। বাইরে থেকে দেখতে—পুরোনো সেকেলে বাড়ি—যেন হৃতগৌরব স্তিমিত ম্লান। ভিতরে গিয়ে কিন্তু ঠিক উলটো—যে রঙের মেলা, প্রাণের সাড়া, ব্যঞ্জনার দীপ্তি আর কল্পনার প্রসারতা দেখলুম, তাতে মন খুশি হয়ে বললে—হ্যাঁ, পেয়েছি। কবির ভাষায়—শহরের অভ্রভেদী আত্মঘোষণার মুখরতা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। দেখলাম র‍্যাফেলের The Virgin and the Child, লিয়নার্ডো দ্যা ভিঞ্চির The Virgin of the Rocks, ম্যুরিলোর The Two Trinities, রয়বেনের The Brazen Serpent। সবগুলিই রূপে রঙে রেখায় প্রকাশ-ভঙ্গীতে অপূর্ব। জ্যাকব জরডেন্স The Holy Familyতে শিশুর চোখে যে আলো ফুটিয়েছেন তার তুলনা নেই। দেখলাম ভ্যান্‌ডাইকের Balbi Children, ক্লডের Embarkation of Queen Sheba। শিল্পী কিভাবে অনুপ্রাণিত হলে, কোন্ গভীরের তন্ময়ত্বে পৌঁছলে এইরূপ অপরূপ শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন সেই কথাই ভাবতে ভাবতে সামনেই নেলসন-স্তম্ভের নিচে এসে পৌঁছলাম। কতকগুলো পায়রা উড়ে গেল। জীবন মানেই কি শুধু ঝটপট আর ছটফট! গতির মধ্যেই কি স্থিতির আমেজ নেই? ভাবি, শুধু অকারণ পুলকের দিন কি হারিয়ে গেল মহাবিস্মৃতির অতলে!

॥ আটত্রিশ

আজকের যুগে ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এসে যদি বিজ্ঞানের আশ্চর্য গবেষণা ও উন্নতির কথা মনে স্পন্দন না জাগায়, শুধু কোন্ হোটেলে কি খেলাম কোন্ জায়গায় আমি কি দেখলাম সেইটি বড় হয়ে ওঠে তবে দেখা ও শোনা, খাওয়া ও বেড়ানো হয় এহ বাহ্য।

চিরকালের মানুষ চেয়েছে জানতে বুঝতে প্রকাশ করতে—তার চিরন্তন প্রশ্ন হচ্ছে—কস্মৈ দেবায়, কে সে দেবতা, কোন্ সে শক্তি, কী সে ছন্দ—কোন্ পথ গ্রাহ্য, কোন্ পথ বাহ্য। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মনে জাগরণে ধ্যানে তন্দ্রায়, কাজের উৎসাহে, চিন্তার বিশ্লেষণে এই প্রশ্নই নানা রূপে নানা ছন্দে জেগেছে, চরম আকুতি নিয়ে, পরম প্রার্থনা রূপে, অনন্ত জিজ্ঞাসা হয়ে—দেখা দাও, দেখা দাও। বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানমন্দিরও সেই তপস্বীর যজ্ঞশালা, সেখানেও চলেছে এই বিচিত্রের, এই অপরূপের, এই অনন্তের রহস্যভেদের প্রয়াস, সীমার মধ্যে অসীমকে ধরার চেষ্টা। জানব বুঝব দেখব সেই জিনিসকে যা অনির্বচনীয়, যা অপরূপ, যা রসস্বরূপ রহস্যঘন—যার মধ্যে সন্ধান পাব অজানার বিচিত্রলীলায়—অথচ যা আমার বুদ্ধির অতীত হবে না, যার সৌন্দর্য মনকে আচ্ছন্ন করবে—এইযে জ্ঞান, এইযে বোধি, এই হচ্ছে বিজ্ঞানীর জীবনবেদ। তাঁরা ব্যক্তিগত ভগবানবাদ মানেন না এ কথা ঠিক, কিন্তু অন্নময় ভূমি থেকে তাঁরা দেখেছেন প্রাণময়ী প্রকৃতিকে। এও ত একদিক দিয়ে বিশ্বরূপ-দর্শন। আইনস্টাইন বলতেন আমি এইটুকু ধারণা করতে পারি যে যুগযুগান্তর ধরে সৃষ্টির মধ্যে এক অনন্ত প্রাণের ধারা বহমান হয়ে রয়েছে, তারই তরঙ্গ উৎক্ষেপে অণুপরমাণুর ঘূর্ণিতে ঘুরছে এই বিরাট বিপুল বিশ্ব।

তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ তাপ আলোকে ছন্দান্বিত সীমাহীন শূন্যের রূপ যখন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি তখন ভাবি, কী বিরাট বিশাল বিপুল এর পরিধি। অথচ এমন দিনও ছিল যখন সূর্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, নক্ষত্র নয়, নীহারিকা নয়, বস্তুবিহীন আকাশ, দিশাহীন শূন্য, রং নেই, রূপ নেই, রেখা নেই। এরই মধ্যে জমাট বাঁধল সৃষ্টির স্তর, এল গতির যতিতে নৃত্যের আবেগ। নটরাজের তাণ্ডবে বিবশ বিশ্ব চেতনায় জাগল—এত শুধু কবির কল্পনা নয়, এযে নিছক বৈজ্ঞানিক সত্য। তপের তাপের বাঁধন

কাটিয়ে রসের বর্ষণে শ্যামল হয়ে এই সুন্দরী ধরণীই জেগে উঠছিল মহাশূন্যে —যে একদিন কায়াহীন মায়াবিনী রূপে আকাশ পথে তূর্য বাজিয়ে সূর্যের পিছনে ঘুরে বেড়াত অভিসারিকার দাহ নিয়ে। কত লক্ষ কত কোটী ব্রহ্মাণ্ড এইরকম ঘুরছে তা কে জানছে! অবাক হয়ে মানুষ আজ কিছুটা বুঝতে পারছে যে এই অনন্তের বুকে ভাসমান ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ লক্ষ ছায়াপথে কি ছোটাছুটিই না চলছে। কোন্ অতি সুদূর অতীত হতে মহাজাগতিক রশ্মির খেলা চলছে, কত পরমাণুর হৃৎকেন্দ্রে এ আঘাত করছে। ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনে মহাজাগতিক বিকিরণের গূঢ়ত্ব আজ বৈজ্ঞানিকরা কিছুটা বুঝতে পারছেন। তাই তাঁরা ঐ তথ্য দিয়ে পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর সমন্বয়সূত্র খুঁজছেন, অণুর সঙ্গে মহতের। বৈজ্ঞানিক যখন এর ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন তখন একে কী বলব —দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি।

পঞ্চাশ বছর আগে ১৭ই জুলাই জার্মানীর বিখ্যাত পত্রিকা, আনালেন ডর ফিজিক (*Annalen Der Physik*)এ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। সাড়া পড়ে গেল প্রতিটি দেশে। ব্যঙ্গচিত্র বেরুল। এ কথা বোঝা যায় যে পদার্থও শক্তি—একটি অন্যেরই রূপান্তরিত সৃষ্টি—কিন্তু এত শক্তি একটি অণু পেলে কোথা থেকে। এতদিন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিল যে দেশ কাল ও বস্তু পৃথক পৃথক সত্তা এবং দেশ ও কাল বস্তুর আধার। বিজ্ঞানের দৃষ্টি ছিল কার্যকারণ সম্বন্ধ (Causality) ও প্রকৃতির নিয়মানুগত্য (Uniformity of nature)। তাঁরা আরও ধরেছিলেন যে ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে ইথার আছে আর ইথারই শক্তির আধার ও বাহন, আর জড়কণাই হচ্ছে বিশ্বের গোড়ার জিনিস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকরা মনে করতেন এই বুঝি বিজ্ঞানের শেষ কথা। পদার্থ অবিনশ্বর, শক্তিরও হ্রাসবৃদ্ধি নেই, পদার্থ আর শক্তি একই অন্যের রূপান্তরিত অবস্থা হতে পারে আর শক্তির উদ্ভব হয় অ্যাটম জুড়ে আর অ্যাটম ভেঙে (ফিউশন ও ফিশন) এই সত্যগুলি তাদের চোখে পড়ে নি। আইনস্টাইন এসেই দুটি প্রশ্ন করলেন—এই যে বিপুলবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এখানে প্রাকৃতিক নিয়মগুলির ধারা ত বদলাচ্ছে না, তাদের রূপ সংজ্ঞা বিবর্তন ঠিকই রয়েছে আর এই যে আকাশে আলোর বেগ এর কি কিছু তারতম্য হচ্ছে?

বৈজ্ঞানিকরা এতদিন একটা 'missing link' যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছিলেন না—অর্থাৎ Earth's absolute motion in space অর্থাৎ আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করি—একে ত মনে হয় বেশ শক্ত আর স্থাণু (stable),

অথচ এটা ত জানি যে এই পৃথিবী গতিশীল—ঘুরছে সে—এর কক্ষপথ মাপা—সেই ঘুর্ণির ফলে রাত হচ্ছে—বর্ষ আসছে বর্ষ যাচ্ছে—গ্রীষ্ম শরৎ বর্ষা হেমন্তের দিনান্তে শীতের তুহিনে এর আহ্নিক পথ বিবর্তিত। শুধু এই পৃথিবীই ঘুরছে না—এই সৌরমণ্ডলও ঘুরছে—যে গ্যালাক্সীতে আমরা আছি, যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা আছি সবই ঘুরছে। নটরাজের নাচের তালে আমরা নাচছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে একটা মহাকর্ষের মহাজালে বহু কোটি নক্ষত্র বেঁধে দিয়ে এই জগৎটা লাটিমের মত পাক খাচ্ছে। আমাদের নক্ষত্র জগতের দূরবর্তী বাইরেকার জগতেও এই দুর্নিবার ঘুর্ণিপাক। চলে বলেই জগৎ। এদিকে অণুপরমাণুর জগতের অণুতম আকাশেও চলছে কালস্রোত বেয়ে ইলেকট্রোন প্রোটনের ঘুর্ণি হাওয়া—তাহলে absolute motionটা কি? বৈজ্ঞানিকদৃষ্টি দিয়ে অঙ্ক কষে আইনস্টাইন সেই কথাতেই এলেন—absolute motion বলে কোনো জিনিস নেই, সবাই সবাইএর সঙ্গে বাঁধা—'relative to some system'. বন্ধনহীন কেউ নেই—তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা—মুক্তি কোথাও নেই। তিনি বোঝালেন—দেখ, একটা মানুষ সীমাহীন কালো সমুদ্রের মাঝে বসে আছে একটা নৌকায় ঘন কুয়াশার মাঝে (a man adrift in sea in a small boat in a fog); কিছুই দেখা যাচ্ছে না—সে বুঝতে পারছে না তার গতিবিধি—শুধু অন্য যাকিছু ভাসছে, যাকিছু দুলছে, যে আলোক বিন্দু বা তীরের আভাস সে দেখতে পাচ্ছে, তারি সঙ্গে তুলনায় তার গতিবিধি সে কিছুটা স্থির করতে পারছে। আর একটা উপমা দিলেন তিনি—এই বিশ্বটা যেন একটা সাবানের ফেনার (soap bubble) বাইরের দিকটা বা ধরুন space বা শূন্যে বেড়াবার জন্য একটি এরোপ্লেন বা রকেটে চড়ে আমরা বেরুলাম। আকাশযানের গতিবেগ আলোর গতিবেগের চেয়ে কম। আমরা যখন ফিরব তখন আমাদের ঘড়িতে যা সময় নির্দেশ করবে তার চেয়ে ঢের বেশি সময় অতীত হয়ে যেতে পারে পৃথিবীতে। যেমন দেবতাদের একদিন পৃথিবীর এক বৎসর। অন্য রকমের আর একটা উপমা দেওয়া চলতে পারে। গরম উনুনের উপর একজনকে বসতে বলা হল—একমিনিট মনে হবে এক ঘণ্টা—আবার সেই লোককেই একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে আলাপ করতে বলা হক, মনে হতে পারে এক ঘণ্টাই এক মিনিট। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লুই ডি. ব্রগলি বলেন—আলবার্ট আইনস্টাইনের 'Works of quality are like blazing rocks which in the dark of the night suddenly cast a brief but powerful illumination over an immense unknown

region,' যেন দিগন্তভরা তিমির অমা নিবিড় রাতের ঘন অন্ধকারের মাঝে রকেটের আলো উদ্ভাসিত হয়ে কিছুটা অজানা দেশকে দেখিয়ে দিয়ে গেল। মাইকেলসন ও মরলি, ফিটজ-জিরাল্ড, লোরেঞ্জ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা এগিয়ে এলেন। তাঁদের পরীক্ষার দ্বারা আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত দৃঢ় হল। আইন-স্টাইন ও আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা প্রমাণিত হল যে দেশ কাল ও বস্তুর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। দেশ ও কাল আধারও নয় আধেয়ও নয়—Time and space are not containers nor are they contents—they are variants. তাহারা বস্তুর অবধারণ মাত্র—বস্তুর কোনো মৌলিক গুণ (primary qualities) নেই, তার গতি (motion) ব্যাপ্তি (extension) বা জড়মান (mass) সবই আপেক্ষিক (relative) সমকালীন (simultaneous) নয়। ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ-এর উপরে দেখা দিল চতুর্থ dimension। কোয়াণ্টাম থিয়োরি নতুন করে গড়ে উঠল। সবই তেজ, সবই ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বৈদ্যুৎকণার সমষ্টি, অতি পরমাণুর ঘূর্ণি ও লাফ। জড়ের জড়ত্ব গেল ঘুচে—তার ভিতরে বিশ্বপ্রাণের সাড়া পাই আর না পাই অরূপ বৈদ্যুতলোকে শক্তির লীলা দেখতে পেলাম।

হাইড্রোজেন সম্বন্ধে নীলসবহরের গবেষণা, অ্যাশটনের আইসোট্রোপ সম্বন্ধে বিচার, স্ট্যান্‌লির ভাইরাস সম্বন্ধে আলোচনা, জিনস্‌ এডিংটনের নানা অনুসন্ধান—সবই বৈজ্ঞানিক মহলে এমন ঝড় তুলেছে যে আজকের আণবিক যুগে বিজ্ঞান বিশ্বকে নতুন দৃষ্টিতে দেখছে। হাইসেনবার্গ প্রডিঞ্জার ত বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করলেন না—তাঁরা দেখেছেন শুধু সম্ভাবনার তরঙ্গমালা (waves of probability), আধারবিহীন বৈদ্যুতিক ভরণের সমষ্টি, দেশ কাল সমবায়ে ঘটনাপুঞ্জ যাহাদের গুণ নির্দেশ করা যায় গাণিতিক সঙ্কেতের দ্বারা (a system of spatio-temporal entities whose qualities are exclusively mathematical)।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—"বিপরীত ধর্মী বৈদ্যুৎকণার যুগল মিলনে যে সৃষ্টি হল সেই জগতটায় দুটি বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া—চলা আর টানা—মুক্তি আর বন্ধন—গতি আর সংযমের অসীম সামঞ্জস্য নিয়ে সব কিছু।" আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আয়তনের স্বভাব অনুসারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। এ বাঁকাই হল বিশ্বের ধারা; যেন সেই চিরবঙ্কিমবিহারীই বিশ্ব ছন্দের মূল সত্য।

দার্শনিক আঁরি বের্গস, লয়েড মরগ্যান, হোয়াইটহেডও বলতে আরম্ভ করলেন

বস্তু জড় নয়, বস্তু চঞ্চল, তারও ভিতরে ভিতরে প্রবল আলোড়ন চলছে, বস্তু পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে উঠছে, নব নব রূপে বিকশিত হচ্ছে, নব নব গুণের উদ্ভব ঘটছে—এই দ্বন্দ্বের (dialectic) পঞ্জরে মৃত্যু হয়ে উঠছে প্রাণ পলকে পলকে। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব উপমায় বলতে গেলে যেন একটি চঞ্চলা নদী আপন বেগের ঝলকে ঝলকে প্রবহমান ক্রমসঞ্চয়ী, ক্রমবর্ধমান, যা থেকে উঠেছে প্রাণলীলার এক নূতন প্রকাশ (creative and emergent evolution)। কাল ধ্বংসশীল নয়, গতিশীল সৃষ্টিশীল (enduring)। ভারতবর্ষীয় চিন্তায় মহাকাল শুধু ধ্বংসের দেবতা নন, সৃষ্টিরও দেবতা আর কালং কলয়তি যা সা তিনিই ত কালী —বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। মায়ার অর্থ কি এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা —তার কোন সত্তা নেই। তাতো নয়—মায়া হচ্ছে অসীম বিশাল সত্যকে সীমার রেখায় 'মিত' করে নাম ও রূপের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা। আমাদের রুদ্রযামলে দেবীকে বলা হয়েছে রূপাতীতা রূপশূন্যা বিরূপা রূপমোহিনী। তাই যোগী যখন গান করেন 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি' তখন সেটাকে কল্পনাপ্রসূত আস্তিক্যবুদ্ধি প্রণোদিত বলে স্বীকার করলেও এও স্বীকার করতে হয় যে এই ঘনান্ধকারের মাঝেই শক্তির স্পন্দন নর্তন ও পরিবর্তন চলেছে। মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের কল্পনাতেও এই রূপক অপূর্বতম হয়ে ফুটে উঠেছে 'সাবিত্রীতে'। কাব্যরসে সিঞ্চিত হয়ে যোগ ও বিজ্ঞানের মূল সূত্র দেখতে পাওয়া গেল—আলোর সাধনাই মানুষের চিরন্তনী সাধনা The Symbol Dawn— Then something in the inscrutable darkness stirred—a nameless movement, an unthought Idea. জাগৃতির প্রথম ছন্দকে এইভাবেই আবাহন করেছিলেন বৈদিক ঋষিরা—মঘোনী, ঋতাবরী শাশ্বতী উষাকে— আলোর প্রথম অমল কমল দল—a long line of hesitating hue. বৈজ্ঞানিকের ফরমূলায় ফেলা যাক—অমনি এ হল ইলেকট্রন্-প্রটোনের ঘূর্ণি ও লাফ, নিউক্লিয়ার বমবার্ডমেন্ট, ফিশন ও ফিউশন্, মহাজাগতিক বিকিরণের রহস্য "In the sweep of the world, in the surge of the ages"। আইনস্টাইনের পরের যুগের বৈজ্ঞানিকরা কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন। আজ ত আমরা হয়েল নারলিকারের নূতন গবেষণার কথা শুনছি। আপেক্ষিক তত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নূতন ভাষ্য করছেন জয়ন্ত বিষ্ণু।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের একটি গল্প মনে পড়ে। গল্পটি উপনিষদের —ভৃগুবারুণি-সংবাদ। বরুণ ঋষির পুত্র ভৃগু বললেন—পিতা, আমায় ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন, ব্রহ্ম অর্থে কোনো হস্তপদবিশিষ্ট দেবতার কথা নয়, সর্বমগূঢ়মন্থ-

প্রবিষ্টম্ যে রহস্য তারি অনুসন্ধান। পিতা বললেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ ব্রহ্মেতি। ভৃগু বসলেন তপস্যায়, দিনের পর দিন যায় রাত্রির পর রাত্রি, চোখের উপর ফুটে উঠে, অন্নময়ী এই পৃথিবী, শস্যমালিনী এই বসুন্ধরা, রূপরসগন্ধস্পর্শ নিয়ে শ্যামকান্তময়ী এ ত মিথ্যা নয়, অন্নই ব্রহ্ম—অন্নই সব বাঁচিয়ে রেখেছে, এই জড়ের দেহে প্রতি অণুতে রয়েছে সেই অন্নময় বীর্যের মহাশক্তি অবরুদ্ধ। সত্যের একটি পর্দা উঠে গেল। জড়ের রহস্যের পিছনে আছে প্রাণের রহস্য—জড় ত প্রাণের কঞ্চুক। ভৃগু আবার বসলেন তপস্যায় —স তপোঽতপ্যত, প্রাণো ব্রহ্ম, যে প্রাণ এজতি—দুলচে কাঁপচে, বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিশে elan vital. আধুনিক বৈজ্ঞানিক হয়তো এইখানেই থামবেন, দেখবেন সেই প্রাণের স্পন্দনকে একটা ছন্দকে, নিয়মকে, Harmonyকে।

কিন্তু এও হচ্ছে দৃষ্টির ভেদ, এক একটি পর্দা খুলে যাচ্ছে, একই সত্য তার বিভিন্ন রূপ। ভৃগু দেখেছিলেন প্রাণেরও পিছনে আছে এক চিৎশক্তি বোধাত্মক মনঃশক্তি—মনোব্রহ্ম। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হন নি, তিনি খুঁজেছিলেন ও পেয়েছিলেন বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি অর্থাৎ যে জ্ঞান, বিরাট বিশাল বিপুল; সর্ব্বং খল্বিদং—তার পরের কথা খুবই সোজা। এই জ্ঞান হলেই শান্ত স্তব্ধ সমাহিত হয়ে আসে মন—উদ্ভাসিত হয় আনন্দম্। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে এটা হয়তো কল্পনার কাব্যময় রূপ কিন্তু যে ছন্দকে ভিত্তি করে এই রূপ উঠেছে তার সম্বন্ধে আইনস্টাইন বললেন, "All knowledge of reality begins with experience and ends with reason gives the structure to the system." তারপর এই কথাই বললেন,—"There can never be any real opposition between religion and science." সত্যই ধর্মবোধ ও বিজ্ঞানের মধ্যে সত্যকার বিরোধ নেই। আজ তাই জুলিয়ান হাক্সলির মত নিরীশ্বরবাদী বৈজ্ঞানিকও বলছেন, "I believe that there exists a scale or hierarchy of values ranging from simple physical comforts up to the highest satisfaction of love, aesthetic enjoyment, intellect, creative achievment, virtue. I do not believe these are absolute or transcendental in the sense of being vouchsafed by some external power or divinity, they are the product of human nature interacting with the outer world." জুলিয়ান হাক্সলি তাই বললেন, "My final belief is in life." আইনস্টাইনও এই কথাই বললেন, বিশ্বাস করি আমি inner harmonyকে, জগৎজীবনের এই ছন্দকে। আজঃযদি

আমরা বলি যে বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দ আর মানুষের জীবনের ছন্দ একই সূত্রে গ্রথিত তাহলেই কি সেটা কাব্য হয়ে গেল—ঋতস্য তন্তু বিততঃ পবিত্র—রহস্যের আধার আর রহস্যের প্রকাশ দুইই মূলতঃ এক—পূর্ণত্বই তার পরিচয়। চৈনিক তাও (Tao) এই কথাই বলেন। একদিকে আমার আমি আর এক দিকে তোমার তুমি এই মিলিয়েই চলছে বিশ্বলীলা—একদিকে সেই মানুষী তমুমাশ্রিতম—আর—এক দিকে ঘোররাবা মহাতামসী প্রকৃতি, তারই মধ্যে ভাঙছে গড়ছে সৃষ্টির প্রবাহ, গড়ে উঠছে ঘটনার পুঞ্জ আর থেকে যাচ্ছে নিত্যচক্রের আবর্তনে সৃষ্টিশীল বীজে অমর একটি সত্তা। আইনস্টাইনের কথায় "the creative and imperishable individuality—the personality." তাই আজ সমালোচকরা কঠোরকণ্ঠে বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক তার পথভ্রষ্ট হচ্ছেন, তাঁরা বিজ্ঞানকে নিয়ে যাচ্ছেন কল্পনার রাজ্যে, প্রায় intuitionএর কাছাকাছি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের বদলে সর্ব্বং খল্বিদং 'mathematical symbol'এ। তাদের কাছে শুধু এই কথাই নিবেদন করবার আছে যে বাস্তব অতিমাত্র শাস্তভাবেই relative এই কথাটাই তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন। খণ্ড সত্য খণ্ড চেতনায় বিধৃত। অনুভূতির এবং পরীক্ষার নানা দিক আছে, নানা dimension আছে। আইনস্টাইনের চতুর্মাত্রিক কল্পনা নিউটনের ত্রিমাত্রিকের বাইরে সীমার মাঝে অসীমকে দাঁড় করিয়ে দিলে অঙ্কের মাপ জোঁকে। মিনকাউস্কির জগৎ প্রমাণ করলে যাকিছু ঘটছে তা ঘটছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে, শক্তি নির্ভর করে পদার্থের ভর ও আলোর বেগের উপর, বস্তুর মাপ বা দুইটি কালান্তর নিত্যবস্তু নয়, এই আকাশ সমাকার নয় বক্রাকার। আর সবচেয়ে বড় কথা যা আইনস্টাইন বললেন যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের অধীন। যে দিন এই কথা ঘোষিত হল সেই দিনই বিজ্ঞানী কবি সাধক দার্শনিক সবাই দ্রষ্টাস্রষ্টার আসন নিয়ে বললেন আমরা দেখছি সেই অঘটনঘটন পটিয়সীকে নানা দিক থেকে—কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ত বিরুদ্ধ নয়। একে যে নামই দিই না কেন যে ছন্দ, যে নিয়ম, যে সৌষম্য যে সামঞ্জস্য, যে সমঞ্জসা রীতি এই বিশ্বের বিধান তাকেই আমরা ভারতবর্ষে বলেছি—সুহঃ বা সুহঃ বা সুহঃ বা সুহঃ তিনিই তিনি, বলেছি তুমিই বিশ্বস্য নিধানং এবং যেখানেই এই ছন্দ আছে সেইখানেই আছেন শান্ত, শিব মঙ্গল, ময়োভব ময়স্কর—সর্বদিকে সর্বরূপে সর্বচিত্তে মূলতঃ এই harmony আছে বলেই তাকে আমরা নামকরণ করেছি সর্বতোভদ্র। সেই দক্ষিণের দাক্ষিণ্য নিয়মানুগ হয়ে রক্ষা করছে এই বিশ্বের নীতিকে রীতিকে আর সম্প্রীতিকে—

তাই আমরা বারে বারে বলি—হে রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহিনিত্যম—যন্ন ভদ্র তন্নাসুব, হে আদি তুমি বিশ্বছন্দ হয়ে প্রকাশিত হও। এইত বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি। এইযে ছন্দ, এইযে সৌষম্য, এইযে নিয়ম এর ভিতরে যে বিশ্বজন্মা শক্তি কাজ করছে সে শক্তি সচেতন না অচেতন এই নিয়েই ত মূল বিরোধ, এই নিয়েই ত প্রশ্ন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে মনে হয় নাকি যে এই প্রশ্নের সমাধান বর্তমান জ্ঞান দিয়ে অসম্ভব। ফসেট, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, আলেক্সিস ক্যারল সবাই বলছেন—Ultimate reality cannot be calculated—অপরিমেয় অবাঙ্মানস গোচর। সব চেয়ে অনাধ্যাত্মবাদী হ্যালডেনও বলেন, "প্রকৃতির পিছনে কিছু নেই এটা ধ্রুব সত্য কিন্তু আমাদের যা জ্ঞান তাতে করে প্রকৃতির পূর্ণ স্বরূপকে জানা যায় না—তার স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের গণ্ডীর চেয়ে ঢের বেশি।" এইযে আবরণ একে অপাবৃণু করার সাধনাই সব সাধনার ইতিহাস—সে বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটারিতেই হোক আর সাধকের অন্তরতম অনুভূতিতেই হোক। কবি · কাব্য, দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী সবই সেই কল্যাণতম রূপের পরিচয় উন্মোচনের জন্য—সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে। আলোর যেমন শেষ নেই, বিশ্বেরও তেমনি সীমা নেই, অনুভূতিরও অন্ত নেই। এই অসীম সত্যের শেষ পরিচয় কোথায় কেউ বলতে পারে না—সেইখানেই বিজ্ঞান দর্শন, সাধনা সকলের শেষ কথা অসীমের তীর্থে মিশেছে—সেই মহাসাগরেরই কূলে আমরা উপলখণ্ড খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এসে এই কথাটাই মনে হচ্ছে—মানুষে মানুষে মিলিয়ে মহাদেবতার আশ্রয় যদি না নিতে পারি তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতিই হোক্ আর দর্শনের সারবত্তাই হোক্ সবই হবে অচলায়তনে মহাপঙ্কের ত্রোটক স্ফোটক নাম জপ। মানবই যে পরমানন্দ সাধক। রবীন্দ্রনাথেরই ভাষা সামান্য একটু অদল বদল করে বলা যায়

যেদিন [illegible]মার গান মিলে [illegible]বে তোমার বীক্ষণে
স্বরের [illegible]
মুক্তির সঙ্গমতীর্থ পাবো আমি সেইক্ষণে
যুক্তির সঙ্গীতে
[illegible] নাই না[illegible] [illegible]স্বর বন্ধন
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমা[illegible] [illegible]ন
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন
ছন্দেতালে ভুলিব আপনা
বিশ্বপদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্তভাবনা।